বিজয়ের ৫৪ বছর

ডিসেম্বর ২০২৫ ◻ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

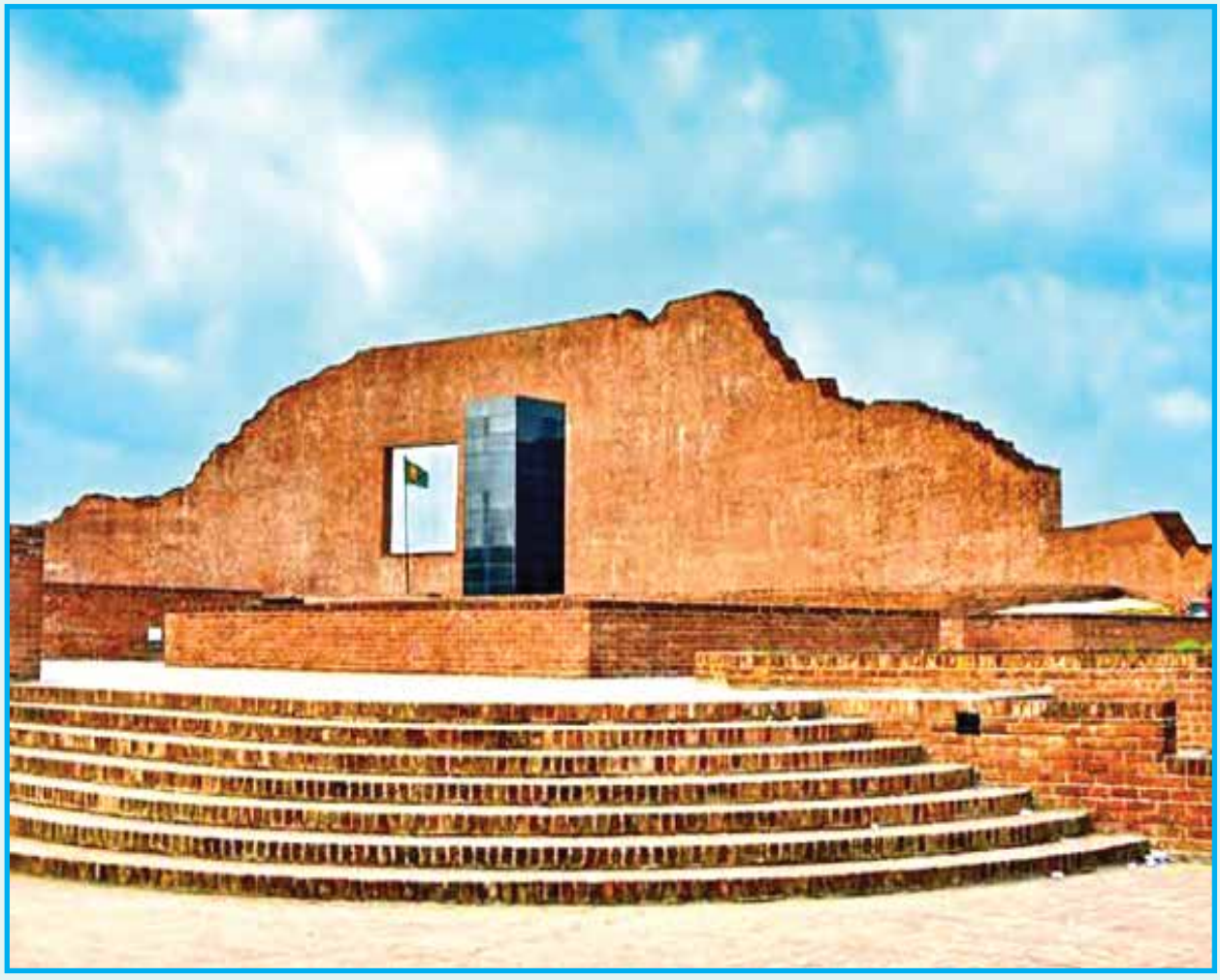

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ডিসেম্বর ২০২৫ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩২

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৫ ঢাকায় সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করেন

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগঃ সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

বাঙালির শত বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির দিন ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, বহু কাঙ্ক্ষিত মহান বিজয় দিবস। এই দিনে রমনার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। লাখো শহিদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের ফলে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছিল নতুন এক দেশের। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের পর ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম ও সহায়সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ভেতর দিয়ে এ বিজয় অর্জন করে বাঙালি। জন্ম হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। এ সংখ্যায় রয়েছে বিজয় দিবসের ওপর গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা দেশবাসীকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন– পরাজিত ফ্যাসিস্ট শক্তি এদেশের পবিত্র মাটিতে আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। আগামী সংসদ নির্বাচনের সময় একইসঙ্গে জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচন ও গণভোট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথরেখা নির্ধারণের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমরা কোন ধরনের রাষ্ট্র প্রত্যাশা করি, তা নির্ভর করবে গণভোটের ফলাফলের ওপর। এই ভোটের মাধ্যমে ঠিক হবে নতুন বাংলাদেশের চরিত্র, কাঠামো ও অগ্রযাত্রার গতিপথ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থে ছিল জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধ নারীকে যেমন অসহায় করেছে, তেমনি সাহসীও করেছে; নারী যোদ্ধা হয়েছে। যে কেবল তরুণী হয়ে উঠেছিল, সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশরক্ষার জন্যে। যে চিরদিন গৃহকোণে উনুনে ভাতের হাড়ি চাপিয়েছে সে বউটিও মুক্তির জন্য জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ করেছে। কোনো তকমা বা খেতাবের জন্য লড়াই করেনি। লড়াই করেছেন পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারী সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, সম্মুখ সমরে অংশ নিয়েছেন এবং গেরিলা বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। নারীর বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা ও সাহসের ফসল আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। এ বিষয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের শৃঙ্খল থেকে নারীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেছেন নারী জাগরণের পথিকৃৎ মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া। উনিশ শতকের শেষদিকে সময়টা ছিল যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমান নারীদের জন্য অন্ধকার যুগ। যে যুগে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে বাঙালি মুসলমানরা মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করত, সেই অন্ধকার যুগে বেগম রোকেয়া পর্দার অন্তরালে থেকেই নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন এবং মুসলমান মেয়েদের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পথ সুগম করেন। এ সংখ্যায় থাকছে বেগম রোকেয়া নিয়ে নিবন্ধ।

এছাড়াও এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ* বিজয় দিবস সংখ্যায় থাকছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিবন্ধ। আশা করি, সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

ভাষণ/নিবন্ধ/গ্রন্থ আলোচনা

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ ৪

ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ ৯
ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বিজয় দিবসের প্রেরণা ১৩
অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ১৮
ড. মো. হাবিব জাকারিয়া

জেন-জি প্রজন্মের বিজয় দিবস ২১
ড. মো. নাজমুল হক

মুক্তিযুদ্ধের অনন্য উপন্যাস: *রাইফেল রোটি আওরাত* ২৪
ড. আশরাফ পিন্টু

শরণার্থী ৭১ ২৬
ড. মোহাম্মদ আলী খান

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি ২৯
ড. শিহাব শাহরিয়ার

বিজয় দিবস ২০২৫: স্বাধীনতার পথে সংগ্রাম অর্জন ও ভবিষ্যতের প্রত্যয় ৩২
ড. সুলতানা আক্তার

১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়োল্লাস: ফিরে দেখা ১৯৭১ ৩৬
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

একাত্তরের রণাঙ্গনে নারীদের কথা ৪১
কামরুন-নাহার-মুকুল

নারীমুক্তির পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া ৪৫
রহিমা আক্তার মৌ

মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম শহরে কয়েকজন মা-বোনের ভূমিকা ৪৮
আইউব সৈয়দ

খুকু রাণীর সাক্ষ্যে নাথপাড়া-আবদুপাড়া গণহত্যা ৫০
ফারুক মুনির

এইডস: আতঙ্ক নয় চাই সচেতনতা ৫২
মো. ফুয়াদ হাসান

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) মাসব্যাপী কার্যক্রম ৫৪

গল্প:

অনিবার্য গন্তব্য ৫৭
রফিকুর রশীদ

আকাশ ছোঁয়ার দিনে ৬১
সুজন বড়ুয়া

কবিতা: ৬০

হাসান হাফিজ, শাহানা সিরাজী, তানিয়া খান, রুস্তম আলী

চলে গেলেন এ কে খন্দকার বীর উত্তম ৬৪

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৫ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন— পিআইডি

প্রিয় দেশবাসী,

শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, নারী-পুরুষ, নবীন-প্রবীণ আপনাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক সালাম ও শ্রদ্ধা।

আসসালামু আলাইকুম।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে দেশে ও বিশ্বজুড়ে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই বিজয়ের উষ্ণ শুভেচ্ছা। আজ বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিন। ১৯৭১ সালে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে এই দিনে আমরা পাই কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের স্বাদ। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা আর লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে পাই একটি স্বাধীন দেশ ও লাল-সবুজের পতাকা।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ স্বাধীনতার জন্য যুগ যুগ ধরে লড়াই-সংগ্রামে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন সেইসব বীর যোদ্ধা ও শহিদদের। তাঁদের এই অবদান আমাদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা ও সাহস জোগায়, সকল সংকট-সংগ্রামে দেখায় মুক্তির পথ।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে নতুন সূর্য উদিত হয়েছিল, বিগত বছরগুলোতে তা স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদে ম্লান হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা আবারও একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছি।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি উন্নত ও সুশাসিত বাংলাদেশের শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলতে যে বিস্তৃত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, দেশের আপামর জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আজ আমরা তার সফল পরিসমাপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনাদের সামনে আজ উপস্থিত হয়েছি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে। এই আনন্দের দিনে গভীর বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি— জুলাই অভ্যুত্থানের সম্মুখযোদ্ধা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ

ওসমান হাদির ওপর সম্প্রতি যে হামলার ঘটনা ঘটেছে, তা শুধু একজন ব্যক্তির ওপর আঘাত নয় এটি বাংলাদেশের অস্তিত্বের ওপর আঘাত, আমাদের গণতান্ত্রিক পথচলার ওপর আঘাত।

শরিফ ওসমান হাদি বর্তমানে সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন। তাঁর চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়েছে। আপনারা তার জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করুন।

সরকার এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা গেছে। আমি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই যারা এই ষড়যন্ত্রে জড়িত, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই পরাজিত শক্তি ফ্যাসিস্ট টেরোরিস্টদের এই অপচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রাস ঘটিয়ে বা রক্ত ঝরিয়ে এই দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না।

আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাই সংযম বজায় রাখুন। অপপ্রচার বা গুজবে কান দেবেন না। ফ্যাসিস্ট টেরোরিস্টরা, যারা অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চায়, আমরা অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের মোকাবিলা করব। তাদের ফাঁদে পা দেব না। পরাজিত ফ্যাসিস্ট শক্তি এ দেশের পবিত্র মাটিতে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের তরুণদের রক্ষা করুন। তাহলে আমরা সবাই এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষা পাবে। যারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে তারা বুঝে গেছে তরুণ যোদ্ধারা তাদের পুনরুত্থানের পক্ষে ভীষণ রকম বাধা। এই অস্ত্রহীন, ভীতিহীন, ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন দৈনন্দিন এই চেহারার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাদের সাংঘাতিক ভীতি। তাদের লক্ষ্য হলো নির্বাচন আসার আগেই পথের এই বাধাগুলো সরিয়ে ফেলা, নিজেদের রাজত্ব আবার কায়েম করা। তাদের বন্ধুরা যতদিন তাদের সঙ্গে আছে ততদিন তারা এই স্বপ্ন দেখবে। নির্বাচন হয়ে গেলে তাদের বন্ধুরা সমর্থন জোগাতে বেকায়দায় পড়বে। সেজন্যইতো এত তাড়াহুড়া। তারা চায় নির্বাচনের আগেই তাদের ফিরে আসা নিশ্চিত করতে। নানা ভঙ্গিতে এটা তারা করবে। এই চোরাগোপ্তা খুন করার উদ্যোগ তার একটা রূপ। আরও কঠিনতর পরিকল্পনা নিয়ে তাদের প্রস্তুতি আছে।

দেশের সবাইকে জোর গলায় বলতে হবে আমরা তরুণদের রক্ষা করব। এখানে পুরানো আমলের দাসত্ব মেনে যারা আছে তাদেরকে দাসত্ব থেকে বের হয়ে আসতে হবে। উৎসবমুখর, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করে আমরা সবাই মিলে দেশের ওপর আমাদের পরিপূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠিত করব। নির্বাচন অব্দি আর বাকি মাত্র দু'মাস। আমরা তাদের উপর নজর রাখব এবং বাকি দিনের প্রতিটি দিন উৎসবমুখর করে রাখব। যেহেতু আমাদের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের মনে কোনো ভয়ডর নেই তাই তারা নির্বাচনের আগের দু'মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে উৎসবমুখর করে রাখবে।

সব রকমের হিংসা, কোন্দল থেকে দেশকে বাঁচিয়ে রাখবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন, জাতীয় নেত্রী, দেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, গণতান্ত্রিক রাজনীতির অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে আছেন। এ বিষয়টি আমাদের সকলের জন্যই উদ্বেগের বিষয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতার বিষয়টি শুরু থেকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতি তার অবিচল অঙ্গীকার, দেশের উন্নয়নে তার অবদান এবং তার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাময় আবেগ বিবেচনায় নিয়ে সরকার ইতোমধ্যেই তাকে রাষ্ট্রের অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে তার চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পরিবারের ইচ্ছাকে সম্মান দেখিয়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। দেশে চিকিৎসার পাশাপাশি প্রয়োজনে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সব বিষয় বিবেচনায় রয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

দায়িত্ব গ্রহণের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তিনটি বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার, একটি জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য রাষ্ট্রকাঠামোর প্রয়োজনীয় মৌলিক সংস্কার এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের বিচারকাজ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক একটি মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল স্বাধীন ও স্বচ্ছ প্রমাণভিত্তিক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের ওপর নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের প্রধান নির্দেশদাতা হিসেবে পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধান শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন।

যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, অভ্যুত্থানের পর পলাতক শেখ হাসিনা এবং এই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অপর আসামি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে দেশে ফেরানোর জন্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন করা হয়েছে। কয়েক ডজন পুরানো আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সংস্কারের সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপ হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদ। মৌলিক সাংবিধানিক সংস্কার নিশ্চিত করার জন্য এটি আদেশ আকারে জারি করা হয়েছে।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে এখন নাগরিকদের অনুমোদন নেওয়ার পালা। তাই আগামী নির্বাচনে আপনাদের সিদ্ধান্ত অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের পথরেখা এখান থেকেই সূচিত হবে। আগামী সংসদ নির্বাচনের সময় একইসঙ্গে জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এই গণভোটে আপনারা হ্যাঁ/না ভোটের মাধ্যমে সংস্কারের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত দিন।

নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। সরকার নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী,

এবারের নির্বাচন ও গণভোট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথরেখা নির্ধারণের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমরা কোন ধরনের রাষ্ট্র প্রত্যাশা করি তা নির্ভর করবে গণভোটের ফলাফলের ওপর। এই ভোটের মাধ্যমে ঠিক হবে নতুন বাংলাদেশের চরিত্র, কাঠামো ও অগ্রযাত্রার গতিপথ।

আমরা চাই এই নির্বাচন হোক সত্যিকার অর্থে উৎসবমুখর, অংশগ্রহণমূলক, শান্তিপূর্ণ এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু। নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা, প্রশাসনিক প্রস্তুতি, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পর্যবেক্ষণের প্রতিটি ধাপকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

একটি বিষয় বার বার মনে করিয়ে দিতে চাই নতুন বাংলাদেশ গঠনের দায়িত্ব আমাদের সবার। আপনাদের মূল্যবান ভোটই আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। তাই ভোটকে শুধুই কাগজে একটি সিল মারার আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখলেই হবে না; বরং এটি হবে নতুন রাষ্ট্র বিনির্মাণে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা এবং দেশকে এগিয়ে নিতে সরাসরি অবদান। দেশের মালিকানা আপনাদের হাতে, আর সেই

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৫ই ডিসেম্বর ২০২৫ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন— পিআইডি

মালিকানারই স্বাক্ষর আপনার ভোট।

এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা অপরিসীম। আমি দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি উন্মুক্ত আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা একে অপরকে প্রতিযোগী হিসেবে দেখবেন, কখনো শত্রু হিসেবে দেখবেন না। নির্বাচনের মাঠে এমন একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করুন, যাতে দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

যারা ভোট বাক্স ডাকাতি করবে তারা দেশের মানুষের স্বাধীনতা হরণকারী। তারা নাগরিকদের দুশমন। তাদের থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা আমাদের সবার অবশ্য কর্তব্য। ভোট জনগণের ভবিষ্যৎ রচনার অক্ষর। ভোট বাক্সে ভোট জমা দিতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ আর রচনা করা যাবে না। আপনার ভোট আপনি সযত্নে ভোট বাক্সে দিয়ে আসুন। কেউ বাধা সৃষ্টি করলে তাকে সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিহত করুন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা নিন।

ভোটের ওপর নির্ভর করছে আপনার আমার সবার ভবিষ্যৎ। আপনার আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ। যোগ্য লোককে ভোট দিন। জাতির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

মনে রাখবেন, ভোট রক্ষা করা দেশ রক্ষা করার সমান দায়িত্ব। ভোট রক্ষা করুন। দেশকে রক্ষা করুন। ভোট দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার গাড়ির চাকা। এই চাকা কাউকে চুরি করতে দেবেন না।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে প্রশাসনকে আরও কার্যকর, নিরপেক্ষ ও নির্বাচনি পরিবেশের উপযোগী করতে সরকার মাঠ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনে বেশ কিছু রদবদল করেছে। এই পরিবর্তনগুলো কারও প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ প্রসূত নয়। এগুলো করা হয়েছে দক্ষতা, যোগ্যতা এবং পেশাগত সক্ষমতার ভিত্তিতে।

আমাদের লক্ষ্য একটাই দেশের প্রতিটি ভোটার যেন ভোট দিতে পারেন নিরাপদ পরিবেশে, ভয়মুক্ত মনে এবং সর্বোচ্চ স্বাধীনতায়।

নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে আরও কোনো পদক্ষেপ প্রয়োজন তা কমিশন অবশ্যই গ্রহণ করবে।

প্রিয় দেশবাসী,

জুলাই সনদ জাতির ভবিষ্যৎ পথযাত্রার একটি ঐতিহাসিক দলিল। এই সনদে আমরা যে সংস্কারমালা প্রস্তাব করেছি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন, প্রশাসনিক জবাবদিহি, দুর্নীতি হ্রাস, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং সমাজে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা-এসব বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন জনগণের সুস্পষ্ট মতামত। কারণ একটি জাতীয় রূপান্তর কখনোই একক নেতৃত্ব বা একটি প্রশাসনের মাধ্যমে টেকসই হয় না; জনগণকেই চূড়ান্ত সম্মতি দিতে হয়।

এই কারণেই আমরা গণভোটের আয়োজন করেছি যাতে দেশের ভবিষ্যৎ সংস্কারদিশা নির্ধারণে জনগণ সরাসরি সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। এই গণভোট হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক। এখানে আপনাদের প্রতিটি ভোট আগামী দিনের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করবে।

এবারের নির্বাচনটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একই দিনে এবার দুটি ভোট। একটি সংসদ সদস্য নির্বাচনের ভোট। আরেকটি গণভোট যার প্রভাব হবে শতবর্ষব্যাপী। কাজেই অবশ্যই ভোট দিন। ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

এর মাধ্যমে আপনারা জানিয়ে দিন আপনারা কি জুলাই সনদের সংস্কার কাঠামোকে এগিয়ে নিতে চান কি না। আপনাদের ভোটই নির্ধারণ করবে রাষ্ট্র কোন পথে অগ্রসর হবে, প্রশাসন কোন কাঠামোয় পুনর্গঠিত হবে এবং নতুন বাংলাদেশ কেমন রূপ পাবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন, জুলাই অভ্যুত্থানের সময় আমাদের প্রবাসী ভাই-বোনেরা কী তৎপরতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন। ফ্যাসিবাদের মসনদ গুড়িয়ে দিতে তারা অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছেন। প্রবাসীদের এই ভূমিকা শুধু জুলাইয়েই নয়, আমরা দেখেছি ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আমাদের এই প্রবাসী ভাই-বোনেরা কখনোই ভোটাধিকার পাননি।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৫ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্যারেড স্কয়ারে ফ্লাইপাস্ট, প্যারাজাম্প ও বিশেষ অ্যারোবেটিক প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেন– পিআইডি

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সক্রিয় উদ্যোগের ফলে প্রথমবারের মতো লাখ লাখ প্রবাসী এবার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে যাচ্ছেন।

এর ফলে প্রবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরাও আনন্দিত। একইসঙ্গে অনেক প্রবাসী নানা জটিলতায় এই উদ্যোগে শামিল হতে না পেরে ব্যথিতও। আপনাদের আবেগের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা রেখে বলছি এবারের যে ধারা শুরু হলো, তা ভবিষ্যতে থামবে না। আগামীতে আপনারা সবাই এই প্রক্রিয়ায় শামিল হতে পারবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

আজ আমি আপনাদের সামনে আমাদের রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার, আইনশৃঙ্খলা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি তুলে ধরতে চাই। একটি আধুনিক, ন্যায়ভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা অত্যাবশ্যক। বহুদিন ধরে বিচার বিভাগ প্রশাসনের বিভিন্ন কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে তার পূর্ণ সম্ভাবনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি। এটি জনগণের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারে বাধা সৃষ্টি করেছে, আর রাষ্ট্রের ওপর মানুষের আস্থাকেও দুর্বল করেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম বড়ো পদক্ষেপ বিচার বিভাগের প্রশাসনিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই ইতোমধ্যে বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাঠামো দিয়ে পৃথক সচিবালয় গঠন করা হয়েছে।

এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। এখন থেকে আর রাজনৈতিক কোনো চাপ বা প্রভাবের মাধ্যমে বিচারিক স্বাধীনতা যাতে ব্যাহত না হয়, সে নিশ্চয়তাও আরও জোরদার হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের দেশের পুলিশ প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যার মুখোমুখি। ফ্যাসিস্ট আমলে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থান্বেষী নিয়োগের কারণে সাধারণ মানুষ পুলিশের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। আমরা চাই এই আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। সেই লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫।

ফ্যাসিবাদী শাসনামলে আমাদের মানবাধিকারহীন এক ভয়াবহ রাষ্ট্রে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়েছে। অথচ সেই ফ্যাসিস্ট সরকারেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি সংস্থার অস্তিত্ব ছিল। মূলত আজ্ঞাবহ লোকদের দ্বারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হতো নিজেদের অপকর্মের বৈধতা নিশ্চিত করার স্বার্থে।

অসাধু ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ জারি করেছে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা আজ এক নতুন ইতিহাসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। এই দেশ আমাদের, এই রাষ্ট্র আমাদের, এর ভবিষ্যৎও আমাদের হাতেই। এখন আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা। আমরা এবারের বিজয় দিবসকে জাতীয় জীবনে নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে নিতে চাই।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণা ধারণ করে জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে যে নবযাত্রা সূচিত হয়েছে, তা এগিয়ে নেওয়াই আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।

আসুন, শতবর্ষের সংগ্রাম ও বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দিতে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুখী ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী এবং লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাই শান্তি, সমৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের পথে। আসুন, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, মানবিকতা ও উন্নয়নের পথে একসঙ্গে এগিয়ে যাই।

সবাইকে আবারও মহান বিজয় দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ।

———— ০ ————

ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর আমার অনুভূতিটা ছিল রোগমুক্তির। যেন একটা কঠিন রোগে পেয়েছিল, দুরারোগ্য ব্যাধি। রোগটা সমষ্টিগত আবার ব্যক্তিগতও। আমরা সবাই ভুগছিলাম, একসাথে এবং আলাদা। বোধটা সামান্য নয়। সাতচল্লিশে আমরা আরও একবার স্বাধীন হই, তখন স্বাধীনতা এসেছিল স্টিমারে করে। সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট দুপুরবেলা যে জাহাজটি এসে থামে, গোয়ালন্দ থেকে পদ্মাপাড়ের ভাগ্যকূলে সেটিকে আমাদের মনে হয়েছিল স্বাধীনতার জাহাজ। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের মস্ত একটা পতাকা পতপত করে উড়ছিল, সদম্ভে। সারা জাহাজ সুসজ্জিত ছিল ছোটো ছোটো অসংখ্য পতাকায়। স্টিমার ঘাটে পল্টুনে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে ঐ জাহাজের প্রতীক্ষায়, যার মধ্যে আমিও ছিলাম। একটি কিশোর। আমার হাতেও নিশান। সেই নিশান নাড়িয়েছি আমরা, জিন্দাবাদ দিয়েছি। জাহাজের রেলিংয়ে দাঁড়ানো যাত্রীরাও দিয়েছে, সমান উৎসাহে। স্বাধীনতার জাহাজ পরে আটকা পড়ে গেছে, চরায়। পাকিস্তান একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে আমাদের জন্য, যার লক্ষণ ও পীড়া স্পষ্ট হচ্ছিল, ক্রমাগত। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ। বাঁচার প্রয়োজনে।

একাত্তরে রোগমুক্তি যে আসন্ন সেটা বোঝা যাচ্ছিল। আমরা জিতব কি জিতব না, এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে নিশ্চয়ই; কখনো কখনো, কারো কারো মনে। অনেকের মতো আমিও নিশ্চিত ছিলাম জিতবই। প্রশ্ন ছিল কবে, কীভাবে, কতটা যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে সেটা ঘটবে। হয়ত সময় লাগবে, ক্ষতি হবে, কে থাকবে, কে থাকবে না কে জানে, কিন্তু রোগটা থাকবে না। যাবেই চলে।

পঁচিশে মার্চের পর থেকে আমার নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা ছিল না। নানা জায়গায় থাকতাম। আমি তখন সকলের সঙ্গে সংলগ্ন, সকল পীড়িত মানুষের সঙ্গেই একত্র; কিন্তু আবার বিচ্ছিন্নও, রোগীরা যেমন হয়। আমার বিচ্ছিন্ন ভাসমানতার কারণ ছিল একটি নয়, দুটি। প্রথম কারণ আমি বাঙালি, দ্বিতীয় কারণ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর হানাদাররা বিশেষভাবে চটা ছিল, ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের যোগাযোগের দরুন। আগের শাসকরা যেমনটা ভেবেছে পাকিস্তানিরাও তার ব্যতিক্রম করেনি, ধরে নিয়েছে ছাত্রদের বিপথগামিতার পেছনে শিক্ষকদের উসকানি কাজ করেছে। সেটা আদৌ সত্য ছিল না। ছাত্ররা কারো উসকানির জন্য অপেক্ষা করেনি। নিজেরাই বের করে নিয়েছে নিজেদের পথ।

প্রাণের দায়ে, বাঁচার প্রয়োজনে। হানাদাররা শিক্ষকদের মধ্যে যে-কয়জনকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করেছিল তাদের মধ্যে আমিও একজন।

পঁচিশে মার্চের রাত্রেই সহকর্মীদের কয়েকজন শহিদ হয়েছেন। ছাত্র এবং কর্মচারীও। সেসব খবর ছাব্বিশ তারিখের ভোরে একেকটি আতঙ্কের মতো এসে পৌঁছাচ্ছিল। পরের দিন সকালে কারফিউ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সপরিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা ছেড়ে বের হয়ে পড়ি। সেই যে বাসা ছেড়েছি, আর ফেরা হয়নি। দুয়েকবার যে এসেছি সে শুধু জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য। ফেরারির মতো। না ফেরার কারণ ছিল। সাধারণ কারণের অতিরিক্ত ঐ বিশেষ কারণ।

হানাদাররা যাদেরকে খুঁজছে তাদের মধ্যে আমার নাম যে রয়েছে সেটা জানা হয়ে গিয়েছিল এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই। আমার এক নিকটাত্মীয় ছিলেন পুলিশে, একেবারে গোয়েন্দা বিভাগেই। সামরিক দপ্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন শিক্ষক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ঐ বিভাগকে বলা হয়েছিল। সে-তালিকায় আমার নাম নীচে নয়, ওপরের দিকেই ছিল, তিনি দেখেছেন। এক বিকালে অফিস সময়ের বাইরে তিনি ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার দপ্তরে, তালিকাটি দেখাতে। চক্ষু ও কর্ণের মধ্যে আর কোনো দূরত্ব রইল না, আমি দেখলাম এবং বুঝলাম যে এর পরে আমার পক্ষে কোনো একটি ঠিকানায় বেশি দিন থাকা নিরাপদ হবে না। তাই করেছি আমি। যাদের আবাসে থেকেছি তারাও যে সবাই খুশি হয়েছেন আমাকে পেয়ে তেমনটা বলা যাবে না। রোগ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, হাসপাতালের রোগীরা যে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে, তা নয়। আমি যে একটি নয়, দুটি রোগে আক্রান্ত সেটা তারা সঠিকভাবে না জানলেও আশঙ্কা তো করতেন। সেপ্টেম্বরে মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও গভর্নর টিক্কা খানের স্বাক্ষর করা চিঠি এসেছিল কয়েকজন শিক্ষকের নামে। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিয়ে। প্রাপকদের মধ্যে নিজেকে দেখে আমি বিস্মিত হইনি, তালিকাটি তো আমার জানা ছিল আগেই।

আমার বন্ধু ও সহকর্মী জয়নুল আবেদীন চলে গেলেন সীমান্ত পার হয়ে। আমি যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না, নানা টানাপড়েনে। আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, যুদ্ধটা বেশ কিছুদিন চলবে, তাই দেশের ভেতরেও সুযোগ থাকবে কাজ করবার।

অবাঙালিদের দেখেছি, আশপাশে। এতদিন উদ্বাস্তু ভাবত তারা নিজেদেরকে, তাদের অনেকেরই এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা। বাংলার অন্ধকার আকাশে তাদের সৌভাগ্য যেন তারার মতো দীপ্যমান। তাদের মধ্যে ভদ্রগোছের যারা সেসব মানুষকেও মনে হতো অহংকারী।

ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে আমরা ঠিক করেছি এবার ঢাকা ছেড়ে চলে যাব, লম্বা সময়ের জন্য। ব্যাংকে যার যা গচ্ছিত ছিল আমরা তুলে নিয়েছি। কয়েকটি রিকশা নিয়ে রওনা দিয়েছি সদরঘাটের দিকে। গ্রামে চলে যাব। এবারও বোধ হয় স্বাধীনতাকে গ্রামে দাঁড়িয়েই দেখতে পাব, ২৩-২৪ বছর আগে একদিন যেমন দেখা পেয়েছিলাম। কথাটা তখন ভাবিনি, কিন্তু ঘটনা ঐরকমই দাঁড়াতো, গ্রামে যদি যাওয়া হতো। যাওয়া হয়নি। সদরঘাটে পৌঁছে দেখি আরও কেউ কেউ এসে গেছেন। সপরিবার। অন্য অঞ্চলের মানুষ তারা, কিন্তু সেদিকে যাওয়ার উপায় নাই, আমরা যাচ্ছি শুনে ঠিক করেছেন আমাদের সঙ্গেই যাবেন, আমরা যেখানে যাই সেখানেই। তাতে তেমন অসুবিধা ছিল না, অসুবিধা যা ঘটবার ঘটল নৌকার অভাবে। পনেরো-ষোলো মাইল যেতে হবে নদীপথে, শীতকাল, বিকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে, সন্ধ্যা নামবে, তারপরেই অনিশ্চয়তা। নৌকা পাওয়া কঠিন হলো। শেষ পর্যন্ত ছাউনিবিহীন মালবাহী বড়ো একটা নৌকার মাঝিদের রাজি করানো গেল বটে, কিন্তু মালপত্র নিয়ে সব মানুষের তাতে জায়গা হয় না, জায়গা হলেও কাত হয়ে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা। ঠিক হলো যারা অতিথি হয়ে যাচ্ছেন তারা ঐ নৌকায় যাবেন, আমরা যারা স্থানীয়, যাদের বাড়িতে ওরা যাচ্ছেন তারা পরে রওনা হব। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় আর কোনো নৌকা পাওয়া গেল না। নিরুপায় হয়ে ভাবলাম পরের দিন সকালে রওনা হব। সেই সকাল আর আসেনি।

সদরঘাট থেকে শহরে নিকটতম আত্মীয় বাড়ি কোনটা তার খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল সেটি ওয়ারীতে। সেই বাসাতেই গিয়ে উঠলাম আমরা, বাকিরা। রাতের জন্য। কিন্তু সেই রাত বড়ো দীর্ঘ হয়েছিল। রাতেই জানা গেল কারফিউ জারি করেছে একটানা। নাকি তারা প্রস্তুত হচ্ছে যাবার আগে শেষ কামড়টি দিয়ে যাওয়ার জন্য। সেটি ভয়ংকরই হবার কথা। বিদেশি রেডিও আশা দিলো, কিন্তু ভরসা দিতে পারল না। চৌদ্দ-পনেরোতে আমরা আটকা পড়ে আছি। যাদের বাসায় আছি, যাদের অসুবিধা হচ্ছে কি না, বাসায় খাবারদাবার কতটা আছে বা নেই, সে-নিয়ে কেউ ভাবছে না। সকলেই একই উদ্বেগে উদ্বিগ্ন, বাঁচা যাবে কী যাবে না। দূরে মাইক্রোফোন দিয়ে কারা যেন কী বলে যাচ্ছে। অবাঙালি গলা। স্লোগানও শোনা যাচ্ছে মনে হয়, ওরা কী তবে মিছিল করে বের হচ্ছে, বাঙালি-নিধনে? থেকে থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। কোনদিক থেকে বলা মুশকিল। শোনা গেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাবে। একজন শুনে এসেছে পানির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবে। আর কিছু না হোক, ডিনামাইট দিয়ে শহরটাকে উড়িয়ে দিতেও তো পারে? আর এটা তো খুবই সম্ভব যে শত্রু ও মিত্র বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি বিনিময়ের

মাঝখানে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে শহরের অনেক এলাকা। রাস্তায় রাস্তায় কী যুদ্ধ হবে, সামনাসামনি, মুখোমুখি, হাতাহাতি? কে জানে।

ষোলোই ডিসেম্বরের সকাল থেকেই বোঝা যাচ্ছিল পাকিস্তানিরা তেমন কিছুই করতে পারবে না, বরঞ্চ তাদের নিজেদের আত্মসমর্পণই আসন্ন। ভারতীয় বেতারে বিভিন্ন ভাষাতে পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হচ্ছে। করলে কী কী সুবিধা তা জানাচ্ছে। না করলে কী কী ঘটবে তাও জানাতে বাকি রাখছে না। জলে স্থলে অন্তরিক্ষে– সবদিকে দিয়েই তারা পাকিস্তানিরা যে অবরুদ্ধ, বলছে সে-কথা। বিদেশি বেতারও সমর্থন করছে সংবাদ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন নতুন খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এক সময়ে শোনা গেল সেই বহু প্রতীক্ষিত সংবাদ। হানাদারেরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়েছে। জানা গেল রেসকোর্সে ঘটবে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। খবর শুনে চারদিক থেকে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে। যেন এইমাত্র রাত কাটালো, সকাল হয়েছে। আমরা কেউ বের হইনি। কিন্তু মনে হয়েছে আমরা আর আগের আমরা নেই। স্বাভাবিক হয়েছি, প্রশস্ত প্রসারিত দীর্ঘ হয়ে উঠেছি, কিন্তু তাই বলে জায়গার কোনো অভাব নেই, সমস্ত দেশই তখন আমাদের। এখন অনেক কিছু ঘটবে। অনেক কিছু পাওয়া যাবে। এখন কোনো অস্থিরতা নেই। বড়ো কথা অসুখটা সেরে গেছে। আমরা নিরাময় হয়েছি।

বিকালে বের হয়েছিলাম। ঐ বাসারই এক তরুণের সঙ্গে। সে আমার স্থানীয় বন্ধু। ঐ কয়দিনের আটককালে বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে। বের হয়েছি রোগমুক্ত মানুষের মতো, স্বস্তি ও আশ্বাস নিয়ে। আমার সঙ্গের তরুণটি অনেক বছর আছে ঐ পাড়ায়। সবাই তার পরিচিত। মোড়ে একটা জটলা দেখিয়ে বলল, ওগুলো রাজাকার ছিল, টিটকারি করত, এখন মনে হয় ভোল পাল্টাবার তালে রয়েছে। রেললাইন পার হয়ে হাটখোলা রোড ধরে এগিয়েছি। দেখলাম লাশ পড়ে রয়েছে, এখানে-সেখানে। সৎকারের লোক নেই, তাকাবারও সময় নেই কারো। এখন যেটি বঙ্গভবন, তখন তা ছিল গভর্নর হাউস, সেই ভবনের কাছে আচমকা দেখি এক তরুণ প্রায় লাফ দিয়ে নামছে আমাকে দেখে। চিৎকার করে বলছে, আপনি বেঁচে আছেন? তারপরেই ভয়ংকর খবরটি দিলো সেই তরুণ। বলল, অনেকেই নেই। চৌদ্দ তারিখে ধরে নিয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় গিয়েছিল ঐ তরুণ, তার প্রিয় অধ্যাপকের খোঁজে, ফুল নিয়ে গিয়েছিল, বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাবে বলে। ফিরে যাচ্ছে অশ্রুসজল চোখে। তার শিক্ষকটি নেই। চৌদ্দ তারিখে কারফিউর ভেতরে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে আল-বদর। একা তাঁকে নয়। আরও অনেককে। কজনকে কে জানে। বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় তখন আহাজারি। আমাকে দেখা যায়নি, কারণ আমি ছিলাম না সেখানে। আমার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না ঐ নয় মাস, না দেখে কারো কারো ধারণা হয়েছে আমিও হয়ত বেঁচে নেই, আমাকেও হয়তবা ধরে নিয়ে গেছে। যাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না তাদের একটি তালিকা শুনিয়েছিল ঐ তরুণ। পথের পাশে দাঁড়িয়ে। শুনে বিজয়ের

আনন্দ যেটুকু ছিল নিঃশেষ হয়ে গেল। কেবল বেঁচে যে আছি এই স্বার্থপর চিন্তাটা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি তখন সেই মুহূর্তে ছিল কি আমার। মনে পড়ে না। তবে স্মরণ করতে পারি যে, মনে হয়েছিল একটু আগে যে কয়েকটি লাশ দেখে এসেছি পথে তারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আমার অত্যন্ত আপনজন হয়ে উঠেছে তারা। আরও অনেক মানুষ, যারা হারিয়ে গেছে তারাও চলে এসেছে। যেন মৃত্যুই সত্য, বিজয়ের পরে।

অল্প কয়েক পা এগিয়ে আরেকটি দৃশ্য দেখেছিলাম সেদিন। সেটাও বিজয়ের নয়, পরাজয়ের। আলোর নয়, অন্ধকারের। গভর্নর হাউস তখন শত্রুমুক্ত। পাহারাদার বলতে কেউ নেই। সেই ফাঁকে কিছু লোক ঢুকছে আর বের হয়ে আসছে। যারা বের হচ্ছে তাদেরকে মনে হচ্ছে বিজয়ী বীর। এইমাত্র শত্রু হত্যা করেছে। যে যা পেরেছে, পেয়েছে হাতের কাছে নিয়ে বের হয়ে আসছে। কারো হাতে টেবিল ফ্যান, কেউ তুলে নিয়েছে সিঙ্গার মেশিন, কেউ গুছিয়ে নিয়ে চলেছে বিছানার চাদর। মুখে বীরের হাসি। বিজয়ীর বিজয় তো ঘটেছিল সেদিন। অত বড়ো পরাক্রমশালী, সুসজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে, চতুর্দিকে আনন্দের ধ্বনি, ছুটছে গুলি, বন্ধু জড়িয়ে ধরছে বন্ধুকে। মস্ত বড়ো সত্য সেটা। কিন্তু ইতিহাসের আরেক ধারাও তো উপস্থিত ছিল। ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিয়েছে বহুজন। সেই ঘাতকরা অন্য কেউ নয়, এই বাংলাদেশেরই সন্তান এবং বিজয় শেষ হতে না হতেই শুরু হয়েছে লুণ্ঠন। সঙ্গে সঙ্গেই এক অন্ধকার মিশে গেছে আরেক অন্ধকারের সঙ্গে।

বিষণ্ন পায়ে ফিরে এসেছি ঘরে। নানান রকম খবর চতুর্দিকে। পাড়ার ছেলেরা যুদ্ধে গেছিল, তাদের কেউ কেউ ফিরে এসেছে। তারা গল্প বলছে নানাবিধ। বীরত্বের, কৌতুকের, কোনোমতে বেঁচে যাওয়ার। একটু পরে দেখি মিছিল বের হয়েছে একটা। ঠিকই, সেই রাজাকারেরাই। সত্যি সত্যি। জিন্দাবাদ দিচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধার তকমা সংগ্রহ করেছে ইতোমধ্যে। গলায় তাদের জোরের অভাব নেই।

রাতে আরেক দৃশ্যের বিবরণ পেলাম। দেখেছে দুজন তরুণ। দেখে ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। আগের দিন, পনেরোই ডিসেম্বর তখনকার স্টেট ব্যাংকের ভোল্ট থেকে টাকা বের করে বন্ধুৎসব বসিয়েছিল পাকবাহিনী। পুড়ে ছাই করে দিয়েছিল টাকার স্তূপ। কিন্তু সবটা পোড়েনি। কিছু ছিল অর্ধ দগ্ধ, কিছু প্রায় অক্ষত। লুঙ্গিতে ভরে বেশ কিছু টাকার নোটের বস্তা বানিয়েছে এক তরুণ; সেই বস্তা মাথায় চাপিয়ে ছুটছে। উন্মাদের মতো। লুঙ্গিটা তার পরনের। পরনের লুঙ্গি খুলে বস্তা বানিয়েছে। লজ্জা সংকোচের কোনো বালাই নেই। ছুটছে। খেয়াল নেই যে সে দিগম্বর, কেননা মাথায় তার টাকার বোঝা।

ষোলো তারিখের চতুর্দিকে গুলির শব্দ। থামছে না। সবটাই আনন্দের, উল্লাসের, বিজয়ের। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, রোগ কেটে যাওয়া মানেই স্বাস্থ্য ফিরে আসা নয়। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সময় লাগবে। নেতৃত্বও প্রয়োজন হবে। সেই নেতৃত্ব পাওয়া যাবে কি, যে নেতৃত্ব পারবে এত সব বিশৃঙ্খলা ও পরস্পরবিরোধী শক্তিকে একত্র করতে, মানুষ ও সম্পদের যে ক্ষতি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে তা পূরণের ব্যবস্থা নিতে। ঐ প্রশ্নের জবাব অবশ্য পাওয়া গেছে।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বিজয় দিবসের প্রেরণা

অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ

১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর। বিকেল চারটা ৩১। রেসকোর্সের সবুজ উদ্যান। পাকিস্তানি ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি তার কাঁধ থেকে সেনাধিনায়কদের সম্মানসূচক অ্যাপলেট খুলে ফেলল। ল্যানিয়াডসহ পয়েন্ট ৩৮ রিভলবারটি ন্যস্ত করল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি ইন চিফ জগজিৎ সিং অরোরার হাতে। নিয়াজির চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা অশ্রু। রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত মুক্তিকামী বাঙালি জনতা ফেটে পড়ল আনন্দোল্লাসে। নিয়াজির নেতৃত্বে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালির বিজয় ঘোষণা করল। এদেশের ইতিহাসে যুক্ত হলো একটি সোনালি অধ্যায়। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সকাল থেকেই ঢাকার সড়কগুলো চলে গিয়েছিল জনতার দখলে। সকাল সাড়ে ১০টার পর সাভার-মিরপুর সড়ক দিয়ে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী জনতার বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ঢাকায়। পথে পথে মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ তাদের স্বাগত জানায়। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সে ছিল এক সোনা ঝরা দিন। ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মাহুতির বিনিময়ে বাংলার আকাশে উড়ল বিজয়ের সূর্য। অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু বিজয়ের সেই গর্ব ও আনন্দ এখনও অম্লান।

যে-কোনো বিচারেই এক ব্যতিক্রমী জনযুদ্ধ বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। সাত কোটি মানুষের বঞ্চনার জ্বালা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মিলেছিল স্বাধীনতার সরণিতে। ব্রিটিশদের ১৯০ বছর ও পাকিস্তানিদের ২৪ বছরের দুঃশাসনের দীর্ঘ অধ্যায় শেষে এ দেশের মানুষ বুঝে নিয়েছিল নিজের অধিকারের স্বীকৃতি। বিজয়ের সে মাহেন্দ্রক্ষণ বিনা আয়াসে আসেনি। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বলদর্পী ঘোষণার পর ছাত্র-জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত 'না-না' ধ্বনির মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছিল প্রতিবাদের ধারা। আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামের সূচনাবিন্দুও ছিল সেটি। এদেশের মানুষ পরম সাহসে জানিয়েছিল, শোষকের রক্তচক্ষুকে তারা ভয় পায় না। সেই থেকে বাহান্নর মহান ভাষা আন্দোলন আর স্বায়ত্তশাসনের দীর্ঘ আন্দোলনের পথ বেয়ে মুক্তি সংগ্রামের সূচনা ঘটেছিল। পাকিস্তানিদের কাছে বাংলাদেশের মানুষ ছিল দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন এক জাতি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে সেই 'দুর্বল' আর 'ক্ষমতাহীন' মানুষই পরিচয় দিলো প্রবাদপ্রতিম বীরত্বের, যে বীরত্বের গল্প লেখা হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। যার সূত্র ধরেই এসেছিল ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়ের সোনালি মুহূর্ত।

রোমান লেখক পাবলিসিয়াস সাইরাস বলেছেন, একতা থাকলে বিজয় আসবেই (where there is unity there is always victory)। বাঙালির এ বিজয় তাদের ঐক্যেরই ফল। পাকিস্তানিরা বার বার চেষ্টা করেছে ঐক্যবদ্ধ এই প্রতিরোধকে ভাঙতে। ২৫শে মার্চের কালরাতে অপারেশন সার্চলাইটের

মাধ্যমে চেষ্টা করেছিল প্রথম ধাক্কাতেই এদেশে মানুষের মনোবলকে গুঁড়িয়ে দিতে। অকাতরে অজস্র মানুষকে হত্যা করে, একের পর এক জনপদকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, সুজলা সুফলা এই দেশকে শ্মশানে পরিণত করার মাধ্যমে এদেশের মানুষকে পরাভব মানাতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি তারা। কিন্তু এদেশের মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে চিরজাগরুক স্বাধীনতার চেতনাকে বুঝতে ভুল করেছিল তারা। তারা ভুলে গিয়েছিল, এদেশেরই এক সূর্যসন্তান সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় উজ্জীবিত এদেশের মানুষ:

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।
'হয় ধান নয় প্রাণ' এ শব্দে
সারা দেশ দিশেহারা
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।

একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের রয়েছে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের দুঃশাসনে পদ্ধতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল এদেশের মানুষ। এদেশের মানুষের শ্রমলব্ধ সম্পদ পাচার করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রতিবছর এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০০ কোটি রুপি। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রপ্তানি আয় দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পণ্য আমদানি করা হতো। এদেশে কল-কারখানাসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ১৯৬৫-এর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিজ্ঞানের সীমান্তকে রাখা হয়েছিল অরক্ষিত, যেন পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের মালমশলা জোগানোই পূর্বাঞ্চলের একমাত্র কাজ। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হতো না। এদেশের মানুষের মনে দানা বেঁধে ওঠা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে বছরের পর বছর। পর্বতপ্রমাণ এ বৈষম্যই তৈরি করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ। তৈরি করেছে এমন এক মোহনা যাতে সাড়ে সাত কোটি চাওয়া একটি অভিন্ন বিন্দুতে এসে মিলেছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের সকল সংগ্রাম ক্রমশ সেই মোহনার দিকেই ধাবিত হয়েছে। ১৯৭১-এর অগ্নিঝরা নয় মাসে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, এদেশের প্রতিটি ইঞ্চিতে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছিল বাংলার মুক্তিকামী মানুষ। যে কিশোর কখনও নিজ গ্রামের চৌহদ্দি পার হয়নি, মাকে ঘুমন্ত রেখে সে কিশোরই চলে গিয়েছিল যুদ্ধে। অগণিত মুক্তিযোদ্ধার কেউ কেউ ফিরেছে, কেউ চিরদিনের জন্য বাংলার সবুজ পতাকায় লাল সূর্য হয়ে মিশে

গেছে। নয় মাসের জনযুদ্ধ আর ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবস তাই কারো একার অর্জন নয়। এতে হিস্যা আছে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের। কৃষক, মজুর, ছাত্র, চাকরিজীবী, নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবার। সমতলবাসী ও পাহাড়ি, প্রত্যেকের।

যে-কোনো বিচারেই আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ছিল এক সত্যিকারের জনযুদ্ধ। কতিপয় স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার ছাড়া বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল এ যুদ্ধে। যে তরুণ অস্ত্র হাতে যুদ্ধে গিয়েছিল তার তুলনায় কোনো অংশে কম ছিল না সেই পল্লি রমণীর অবদান, যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন বা তাদের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিয়েছেন। ঘরে ঘরে সাধারণ মানুষ প্রার্থনার

হাত তুলেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় কামনা করে। অনেক ক্ষেত্রে মা নিজেই সন্তানকে পাঠিয়েছেন অস্ত্র হাতে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য। পাকিস্তানিদের নির্যাতন-নিপীড়ন যতো তীব্র হয়েছে, বাঙালির প্রতিরোধী চেতনা ততো শক্তিশালী হয়েছে। এ চেতনার সামনে পাকিস্তানিদের আধুনিক অস্ত্র আর গোলাবারুদ কোনো কাজে আসেনি।

নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন এক দেশ পেলাম বটে, কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারের সুশাসন ও দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্নকে ম্লান করে দিলো। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনায় এই ব্যর্থতা সদ্য স্বাধীন দেশটিকে নিপতিত করল অন্ধকারে। এ সময় যেখানে প্রয়োজন ছিল উন্নয়নমুখী মানবতাবাদী নেতৃত্ব, সেখানে আমরা পেলাম মানবতাবিরোধী, অগণতান্ত্রিক এক শাসন। হাজার হাজার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হলো। দেশের অবকাঠামো খাতে কোনো উন্নয়ন ঘটানো হলো না।

মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে গলা টিপে হত্যা করার উদ্যোগ নেওয়া হলো। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে এদেশে দেখা দিলো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ভয়াবহতায় এ দুর্ভিক্ষ বাঙালির ইতিহাসের ভয়ংকরতম মন্বন্তরগুলোর সঙ্গে তুলনীয়। সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি এবং সরকারি অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা দুর্ভিক্ষের প্রকোপকে অনেকটাই বাড়িয়ে তোলে। মানুষ প্রবল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পায়, রাস্তায় যখন অনাহারে শিশুরা মৃত্যুবরণ করছে, বস্ত্রের অভাবে যখন হাতের কাছে যা পায় তা দিয়েই লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছে, শাসকদলের সদস্যরা সেখানে চরম বিলাসিতায় দিনাতিপাত করছে। তাদের কাছে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের যেন কোনো মূল্যই নেই। শোষণ, নির্মমতা ও দুঃশাসনের এ চিত্র পরিস্থিতিকে ক্রমশ আরো দুঃসহ করে তোলে। ক্রমে দানা বেঁধে ওঠে নীরব বিদ্রোহ। ক্ষমতাসীন দল এ বিদ্রোহকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় একদলীয় দুঃশাসন। সরকারি নিয়ন্ত্রিত চারটি পত্রিকা ছাড়া বাকি সব পত্রিকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করে সারাদেশে একদলীয় আওয়ামী বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় ঘটে ১৯৭৫ সালের রক্তাক্ত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন।

এ পরিবর্তন স্বাধীনতার মহান ঘোষক জিয়াউর রহমানকে এনে দেয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। সিপাহী জনতার সফল বিপ্লব তাঁকে আসীন করে রাষ্ট্রক্ষমতায়। ক্ষমতায় এসেই তিনি দেশে গণতন্ত্রের নতুন যাত্রা শুরু করেন। বিরোধী দল ও মতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন। সূচনা করেন উন্নয়নমুখী নতুন এক রাজনীতির, যে রাজনীতির কেন্দ্রে আছে দল মত নির্বিশেষে সব মানুষকে নিয়ে নতুন এক বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রাম। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা এক প্রশাসক। বাণিজ্যিক উদারীকরণ ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের নীতি অনুসরণ করেন। বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতির দুই শক্তিশালী ভিত্তি রেডিমেড গার্মেন্টস এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্স, দুটোরই সূচনা ঘটে তাঁর শাসনামলে। খাল কাটা কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনেন। দেশমাতৃকার এই মহান সন্তান যখন আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর ভবিষ্যৎমুখী নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় নেতৃত্বের আসনে আসীন করছেন তখনই ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর হয়ে ওঠে। বিপথগামী একদল সেনাসদস্যের হাতে মৃত্যু হয় তাঁর।

তারপর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দীর্ঘ স্বৈরশাসন শেষে নব্বই দশকের শুরুতে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পুনরায় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হয় বাংলাদেশে। নব্বই ও শূন্য দশক-উভয় দশকের প্রারম্ভেই বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ছিল। কেবল সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনই নয়, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা ও উন্নয়নমুখী নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশকে একটি মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয় এ সময়টাতে। কিন্তু ২০০৮-এর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে দেশে নেমে আসে একনায়কতান্ত্রিক দুঃশাসন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মহান সব অর্জনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত শুরু হয়। একের পর এক একতরফা ও ভুয়া ভোট আয়োজনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে পাঠানো হয় নির্বাসনে। স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনা ও তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে তৈরি করা হয় এক কাল্ট। এ কাল্টের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিপূজা। জনগণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে 'উন্নয়নের রাজনীতি' নামের এক বায়বীয় ধারণাকে সামনে রেখে স্বজনতোষণ, ব্যাংক লুটপাট, বিদেশে অর্থ পাচারসহ দুর্নীতির মহোৎসব শুরু হয়। সকল অন্যায় অত্যাচার, দুর্নীতি ও দুঃশাসনকে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র মোড়কে জনগণের সামনে হাজির করা হয়। দীর্ঘ এ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ করলেও নেমে এসেছে দুঃসহ নির্যাতন। এজন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি উপকরণকে ব্যবহার করা হয়েছে নির্বিচারে। বাংলাদেশের মানুষ পরিচিত হয় 'গুম' নামের ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের সাথে। প্রতিবাদী মানুষ, বিশেষ করে বিরোধী মতাদর্শের সমর্থনকারীরা গণহারে গুম হতে থাকেন। এদের বেশিরভাগেরই আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। স্বৈরশাসনের পতনের পর মানুষ জানতে পারে, গুম হওয়া মানুষদের অনেককেই রাখা হতো 'আয়নাঘর' নামের এক কারাগারে, যেখান থেকে বেঁচে ফিরে আসা মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা।

২০১৪, ২০১৮, ২০২৪-একের পর এক একতরফা ও ভুয়া নির্বাচন করার মাধ্যমে মানুষের মত প্রকাশ ও বেছে নেওয়ার

অধিকারকে কুক্ষীগত করা হয়। বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পেশীশক্তির প্রয়োগ আর মামলা-হামলা দিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়। কিন্তু কথায় আছে, রাত যতো গভীর হয় প্রভাত ততো নিকটে আসে। অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণের নিচেই ক্রমশ উদিত হচ্ছিল নতুন এক বিজয়ের সূর্য। ১৯৭১-এর পাকিস্তানি হানাদারদের দুঃসহ নির্যাতনের বিরুদ্ধে যেমন বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, ২০০৮-২০২৪-এর শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের। বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ায় এদেশের সাধারণ মানুষ। চাকরিতে মাত্রাতিরিক্ত কোটা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে মাঠে নামে প্রতিবাদী ছাত্র-জনতা। অচিরেই দেখা যায়, এটি আর কেবল ছাত্রদের আন্দোলন নেই, দেড় দশক ধরে মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ এবার এসে মিশেছে স্বৈরাচারী হটানোর সংগ্রামী মোহনায়। যেন মুক্তিযুদ্ধের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলো আবার ফিরে এলো। আবার যেন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে শ্রেণি, পেশা, বয়স নির্বিশেষে সব মানুষ নেমে এলো রাস্তায়। স্বৈরাচারের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলোর মতোই তারা গেয়ে উঠল।

বৈশাখের ওই রুদ্র ঝড়ে
আকাশ যখন ভেঙে পড়ে
ছেঁড়া পাল আরও ছিঁড়ে যায়
হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়
হঠাৎ কে যে শঙ্খ শোনায়
দেখি ঐ ভোরের পাখি গায়

অবশেষে জুলাই-আগস্টের ৩৬ দিনের অবিস্মরণীয় এক গণজাগরণ ঘোষণা করল জনতার জয়। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ছাত্র-জনতার প্রবল প্রতিরোধ যেভাবে পাকিস্তানি অপশাসনের কবর রচনা করেছিল, ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের আন্দোলনও ঘোষণা করল জনতার জয়। প্রমাণ করল, যে জাতি একাত্তরে জয়ী হয়েছে, চব্বিশের গণ-আন্দোলনেও জয় তাদেরই হবে। স্বৈরাচারের পতনের মুহূর্তটিতে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস তৈরি করল অসাধারণ সব মুহূর্ত। আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন বলেছিলেন, 'there is a certain enthusiasm in liberty, that makes Inuman nature rise above itself, in acts of bravery and herinsm,' স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই জন্ম নিলো অসাধারণ সব বীর। রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করলেন শেক্সপিয়ারের সেই উক্তিকে: কাপুরুষ মৃত্যুর আগে অজস্রবার মরে, কিন্তু বীরেরা মৃত্যুর স্বাদ নেয় মাত্র একবার।' আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধ, ওয়াসিম আকরাম, ফারহান ফাইয়াজসহ অজস্র বীর যেন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের স্মৃতিকে আবার ফিরিয়ে আনলেন। সাধারণের মধ্যেই জন্ম হলো অসাধারণত্বের। স্বৈরাচারের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে তাঁরা রচনা করলেন নতুন ইতিহাস।

শেখ হাসিনার দেড় দশকের স্বৈরশাসনের দিনগুলোতে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছিল একপক্ষীয় বয়ান। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যে-কোনো উদ্যোগকে 'মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতা'র তকমা দিয়ে চালানো হতো নির্যাতনের স্টিমরোলার। জুলাই-আগস্টের গণ-আন্দোলন সেই বয়ান থেকে বের করে এনেছে বাংলাদেশকে। যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে কৃষক, মজুর, কুলি আর শ্রমিকেরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিল হাতে, তাদের অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করার নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে এ অভ্যুত্থান। জুলাই গণজাগরণ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে পরিচালিত করার প্রেরণা জাগিয়েছে। যে-কোনো মূল্যে এই প্রেরণাকে ধরে রাখতে হবে।

জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিজয় দিবসের নতুন শিক্ষা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনো নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ নয়। এটি সব মানুষের, সবার। মুক্তিযুদ্ধে যেমন অবদান ছিল সকল বাংলাদেশির, তেমনি বিজয়ের গৌরবও এদেশের সাধারণ মানুষের। উন্নয়নের রাজনীতি, চেতনার রাজনীতি ইত্যাদি মোড়কে কোনোভাবেই এদেশে পুনরায় স্বৈরশাসনের আবির্ভাব ঘটতে দেবে না বাংলাদেশের মানুষ। জুলাইয়ের শিক্ষা বুকে নিয়ে ভবিষ্যতের 'সব মানুষের বাংলাদেশ' গড়ার শপথ তাই আমাদের নিতে হবে এই বিজয় দিবসেই।

অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ: প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[সৌজন্য : বিজয় দিবস ক্রোড়পত্র ২০২৫]

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণে স্বাধীন বাংলাদেশ, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা

ড. মো. হাবিব জাকারিয়া

বাংলাদেশে জুলাই ২০২৪-এর পর 'ইনক্লুসিভ' শব্দ ও ধারণাটি জনপরিসরে বিস্তর আলোচিত হয়েছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আলোচনায় এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছিল। সময়ের পরিক্রমায় সেই আলাপ গুরুত্বের তালিকায় নিম্নগামী হতে হতে প্রায় অপস্রিয়মাণ। তবে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক ন্যায় এবং রাজনৈতিক বৈধতার প্রেক্ষাপটে ইনক্লুসিভিটি ক্রমে অপরিহার্য আলোচ্য হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইনক্লুসিভিটি (inclusivity) বলতে সাধারণত বোঝায় রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সম্পদ বণ্টন প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিকের সমান অংশগ্রহণ, অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা। এই ইতিবাচক বাসনা নিয়ে দ্বিমত পোষণ দুরূহ। ইনক্লুসিভিটিকে একটি রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ইকোসিস্টেমও বলা যায়। কৃষিযুগের পর থেকে মানব সভ্যতা যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গঠিত হয়েছে, সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে মানুষের জীবনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা সহজ নয়। বাস্তবে বাসনার সত্য আর বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা প্রায়শই বিপরীতমুখী হয়ে উঠে। এর মূলে রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট এবং বিদ্যমান কাঠামোয় অভ্যাসজনিত দাসত্ব। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে বিশ্বপ্রকৃতি স্বরূপগতভাবেই ইনক্লুসিভ। রাষ্ট্রও সেই ইকোসিস্টেমকে আত্মীকরণ করে মানব ও প্রকৃতিবর্তী হতে পারে।

এই বাসনাকে ইউটোপিক বলার উপায় নেই, কারণ ইনক্লুসিভিটি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সাথে বিজড়িত। রাষ্ট্র অস্তিত্বশীল তার স্বাধীনতায়, ব্যক্তিও তাই। ব্যক্তি স্বাধীনতা হলো ইনক্লুসিভিটির ভিত্তিমূল, আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তার প্রাতিষ্ঠানিক পরিণতি। সুতরাং ইনক্লুসিভিটি একার্থে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা তথা অস্তিত্বের সমার্থক। কিন্তু সচরাচর লক্ষ

করা যায়, স্বাধীনতা বিষয়টিকে স্বাধীনতা অর্জনের নির্দিষ্ট সময়কালের ইতিহাসের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। যেন স্বাধীন ভূখণ্ড অর্জনই স্বাধীনতার প্রশ্নে শেষ কথা। বড়োজোর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, অন্যান্য রাষ্ট্রের আধিপত্য ও অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত থাকা এসবই স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আলাপের পরাকাষ্ঠা। ফলে স্বাধীনতা যে একটি লম্বা সফর এবং শেষাবধি ব্যক্তি স্বাধীনতা তার গন্তব্য, সেই চিন্তাক্ষেত্র অদ্যাবধি ক্ষীণস্বরই রয়ে গেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাথে একীভূত করে দেখা অদ্যাবধি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান ও চর্চা, সেকথা বলার উপায় নেই। এমতাবস্থায় আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বে ইনক্লুসিভিটি এমন একটি ধারণা, যা রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতার এই দুই স্তরকে একক তাত্ত্বিক কাঠামোয় সংযুক্ত করে। ঠিক সে কারণেই আলোচ্য প্রসঙ্গের অবতারণা।

বাংলাদেশ ভূখণ্ডগতভাবে স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালে। কিন্তু একটি রাষ্ট্রকে তখনই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন বলা যায়, যখন তার রাজনৈতিক কাঠামো অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক এবং আইনসম্মতভাবে প্রত্যেক নাগরিককে অধিকারচর্চার সুযোগ দেয়। জন রলস সেই কথাই বলছেন। তাঁর মতে– ব্যক্তি স্বাধীনতাই রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা অনুপস্থিত হলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের আলোচনাই অর্থহীন। কারণ রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যই হলো নাগরিকের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করা। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আসলে জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার সম্প্রসারিত রূপ। ব্যক্তি স্বাধীনতা কেবল ব্যক্তিগত বিষয় নয়; এটি সমাজে ন্যায়, সমতা এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমষ্টিগত রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি গড়ে তোলে। ফলে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ইনক্লুসিভিটিকে মনোযোগের কেন্দ্রে রাখা হলে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুসংহত ও নিশ্চিত হয়ে যায়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র সূচনা থেকেই নিজেকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী' হিসেবে ঘোষণা করেছে। ফিলিপ পেটিট এ প্রসঙ্গে বলেছেন– 'গণপ্রজাতন্ত্র হলো সমষ্টিগত অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বশাসন।' সুতরাং, ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখে রাষ্ট্রে নাগরিকবৃন্দের অংশগ্রহণই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। এই অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তাই ইনক্লুসিভিটিকে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র এবং ইনক্লুসিভিটির সম্পর্ক অর্গানিক এবং অবিচ্ছেদ্য। উপরিউক্ত মতের স্বপক্ষে মিশেল ফুকো এবং অমর্ত্য সেনকে যুক্ত করা সম্ভব। ফুকো বলেছেন– রাষ্ট্র কেবল আইন ও বিধির সমষ্টি নয়, বরং এটি নীতি, শাসন প্রক্রিয়া, জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা এবং জ্ঞান-ক্ষমতার কাঠামো হিসেবে সক্রিয় থাকে। বিকেন্দ্রীভূত ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্রক্ষমতা সুরক্ষিত নাগরিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। অমর্ত্য সেন স্বাধীনতাকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পরিপূর্ণ হয় প্রতিটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সক্ষমতার বাস্তব সম্প্রসারণের মাধ্যমে। এটি ব্যক্তি গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের যুগপৎ চলন প্রক্রিয়া। যেখানে রাষ্ট্র এমন রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করে, যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীবান্ধব। সেই কাঠামো ক্রমাগত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে যেখানে তার বা তাদের নির্বিঘ্ন ও পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত হয়। যা আদতে ইনক্লুসিভিটিরই পরিধিভুক্ত। জন স্টুয়ার্ট মিলও বলেছেন, নিজের কল্যাণকে নিজের মতো করে বাস্তবায়ন করার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

এই 'নিজ' শব্দে সমষ্টি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ব্যক্তি। আর রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে কল্যাণ ধারণায় সকলকে অন্তর্ভুক্ত রাখা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানেও ইনক্লুসিভ রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন রয়েছে। যখন বলা হয়– প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ, মানুষের মর্যাদা ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মানের কথা যখন বলা হয়, তখন মূলত ইনক্লুসিভিটিই অন্যতম ভিত্তি হিসেবে সক্রিয় থাকে। যেমন–

১. জাতীয়তাবাদ : ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি
২. সমাজতন্ত্র : অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি
৩. গণতন্ত্র : রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি
৪. ধর্মনিরপেক্ষতা : ধর্মীয় অন্তর্ভুক্তি

আবার সংবিধানের ৩১, ৩২, ৩৭, ৩৮ ও ৩৯নং অনুচ্ছেদে যখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, চলাফেরা, সমাবেশ, সংগঠন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হয়, তাও ইনক্লুসিভিটিকেই প্রাধান্য দেয়। অতএব, বাংলাদেশের সংবিধান নিজেই একটি ইনক্লুসিভ রিপাবলিক-এর তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করে। উপরিউক্ত প্রসঙ্গগুলোর বাহিরেও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিশ্রুতি, বিকেন্দ্রীভূত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার, বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চার ভেতরে একই বাসনার বীজ রোপিত।

ড্যারেন অ্যাসেমগলু এবং জেমস এ. রবিনসন তাই বলছেন– রাষ্ট্র তখনই কার্যকর হয়, যখন তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইনক্লুসিভ। জাতিসংঘও ইনক্লুসিভ গভর্নেন্সকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মৌল বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এককথায় স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য ইনক্লুসিভ হওয়া অপরিহার্য। তবুও একেবারে প্রাথমিক দৃষ্টিতে যদি ইনক্লুসিভিটিকে দেখা যায় তাহলে তিনটি প্রত্যাশার ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা যেতে পারে–

১. রাজনৈতিক ইনক্লুসিভিটি : ভোটাধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব।
২. সামাজিক ইনক্লুসিভিটি : লিঙ্গ, ধর্ম, শ্রেণি ও জাতিগত বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি।
৩. অর্থনৈতিক ইনক্লুসিভিটি: শ্রমবাজার, সম্পদ ও সুযোগে সমান প্রবেশাধিকার।

প্রসঙ্গগুলো মূলত ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথেই সম্পর্কিত। একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ইনক্লুসিভিটির স্বার্থে নিজেকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহির আওতায় রাখবে, নাগরিক অধিকারবান্ধব আইন ও নীতি প্রণয়ন করবে, বৈষম্যহীনতা ও সমতার নিশ্চয়তা বিধান করবে এবং তৃণমূল অবধি অর্থনৈতিক সাম্য রক্ষা করবে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে নাগরিক অধিকারের আওতায় নিয়ে আসবে এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। এর বাহিরে খুব সাধারণ বিবেচনায় স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্যক্তির প্রত্যাশা থাকে মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা এবং সংগঠিত হবার উদার এখতিয়ার। এ সবকিছুকে এক শব্দে বলা যায় নাগরিক অধিকার। এই নাগরিক অধিকার যখন প্রান্তিকতম জনগোষ্ঠীর একজন ব্যক্তির জীবনে বাস্তব হয়ে উঠবে তখনই একটি রাষ্ট্রকে প্রত্যয়ের সাথে স্বাধীন রাষ্ট্র বলা যাবে। যেখানে ইনক্লুসিভিটি প্রধান নিয়ামক শক্তি।

কিন্তু এই স্বাভাবিক, সর্বসম্মত এবং আইনসিদ্ধ প্রসঙ্গ নিয়ে নতুনভাবে আলাপের প্রয়োজন কেন হয়? এজন্যই হয়, যখন সমস্ত আইন ও অবকাশ সত্ত্বেও ইনক্লুসিভিটির বিপরীতে শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, বার বার ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নাগরিক অংশগ্রহণের পরিসর সংকোচিত হয় এবং অর্থনীতি ক্রমাগত নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর করায়ত্তে থেকে যায়। এমতাবস্থায় জরুরি সর্বজনের মুক্ত যোগাযোগ, মতপ্রকাশ ও যাপনের স্বাধীনতার মাধ্যমে হ্যাবারমাস কথিত 'ইনক্লুসিভ জনক্ষেত্র' সৃষ্টি করা। এই পরিসরই রাষ্ট্রকে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা দেবে এবং ইনক্লুসিভিটির মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে কার্যকর রাখতে সক্রিয় করবে। বিশ্বায়নের কালে অনিবার্য বহির্বাস্তবতাকে ভারসাম্যে রাখতেও এটিই হবে রক্ষাকবচ।

তথ্যসূত্র:

1. Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. Why *Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty.* New York: Crown Publishers, 2012.

2. Foucault, Michel. "Governmentality." In The Foucault Effect: Studies in Governmentality, edited by Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

3. Pettit, Philip. Republicanism: *A Theory of Freedom and Government.* Oxford: Oxford University Press, 1997.

4. Rawls, John. *A Theory of Justice.* Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

5. Sen, Amartya. *Development as Freedom.* New York: Alfred A. Knopf, 1999.

6. Mill, John Stuart. *On Liberty.* Oxford: Oxford University Press, 1991.

7. Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere.* MIT Press, 1991.

8. *Bangladesh Constitution* (1972, amended 2011). Government of Bangladesh. Online version: https://bdlaws.minlaw.gov.bd

9. United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Reports.* https://hdr.undp.org

---

ড. মো. হাবিব জাকারিয়া: অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, habibzakariaullash@gmail.com

জেন-জি প্রজন্মের বিজয় দিবস

ড. মো. নাজমুল হক

বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপট: শত সহস্র বছরের কালপরিক্রমায় রক্তাক্ত জনযুদ্ধের মাধ্যমে উদ্ভূত বাংলাদেশের ইতিহাস নিঃসন্দেহে এদেশের নাগরিকদের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবমণ্ডিত অধ্যায়। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত উপনীত হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো সর্বাধিক দৃশ্যমান ছিল, তার মধ্যে পূর্ব বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের ভয়াবহ বৈষম্যমূলক আচরণ; একই দেশের দুটি অংশের মধ্যে একটিতে অর্থনৈতিক বঞ্চনা, ব্যবসাবাণিজ্য, চাকরি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিসীম ভারসাম্যহীনতা অন্যতম। বলা বাহুল্য, অনুরূপ প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ শাসনের শেষ অর্ধশতক ব্যাপী লড়াই-সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে যায় দুটি রাষ্ট্রে। তবে পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল অস্বাভাবিক। সহস্রাধিক মাইল দূরবর্তী ভূখণ্ডকে একক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালনার জন্য যে দূরদর্শিতা, মেধা ও দক্ষতার প্রয়োজন, সদ্য গঠিত পাকিস্তানের কাছে সেটি ছিল খুব কমই। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির রূপকার রাজনীতিবিদদের মধ্যে যারা ছিলেন উর্দুভাষী, তারা চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে। পক্ষান্তরে, বাংলাভাষী রাজনীতিবিদরা মূলত কলকাতা থেকে চলে আসেন পূর্ব বাংলায়।

পাকিস্তান নামক দেশটির দুটি দূরবর্তী ভূখণ্ড সৃষ্টির ব্যাপারেও ছিল নানা মতভেদ, বিরোধিতা, রাজনৈতিক প্রতারণা, নেতৃবৃন্দের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থতার প্রতিযোগিতা। তদুপরি ছিল ভাষা ও ধর্মীয় মতাদর্শগত বাড়াবাড়ি। ফলে, পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির দেড়-দু'বছরের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র লাভের স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। এর প্রথম আঘাত আসে সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অস্বীকৃতি। শুরুতেই বাংলাভাষী জনগণ লাভ করেন দীর্ঘ পাঁচ বছরের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। তবে এর মাঝেই আরেকটি ঘটনা ঘটে, যাকে বলা হয় জাতীয়তাবাদ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের পথে বাঙালির অভিযাত্রা। এই পথ ধরেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সেক্যুলার দর্শন এবং ইসলামিক চিন্তাধারার ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ প্রকাশের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে প্রকট।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকের মধ্যভাগ সময়কালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সুস্পষ্ট পার্থক্য। এই পর্যায়েই পরিস্ফুট হয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিবিরোধী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষপাতদুষ্ট চরিত্র। ইতোমধ্যে প্রবর্তিত হয়েছে সামরিক শাসন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই অঞ্চল পরিণত হয়েছে পশ্চিমাদের ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল তৈরির উর্বর ক্ষেত্র, বর্তমান কালের মতো সহস্র কোটি মুদ্রা পাচারের সূচনাপর্বের উত্থান। বাঙালিদের ভাগে পড়েছে কেরানি ও নিম্নমানের চাকরি। 'পলিসি মেকিং'

পদে প্রায় সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। পূর্ব পাকিস্তানের যে দু'চারজন মন্ত্রী বা সচিব হয়েছিলেন, তারা প্রায় সকলেই কাজ করেছেন পশ্চিমাদের পক্ষে। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রবেশাধিকার ছিল অতি নগণ্য।

পশ্চিমা আগ্রাসনের ব্যাপক প্রভাব পড়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার ওপর। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে ছাত্র-জনতা, এমনকি কৃষক-শ্রমিক-মজুর শ্রেণির চিন্তা-চেতনাতেও ফুটে ওঠে বিদ্রোহের আভাস। এই প্রেক্ষাপটেই ভেতরে ও বাইরে ফুঁসে উঠতে শুরু করে আপামর জনসাধারণ। দাবি ওঠে স্বায়ত্তশাসনের। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হন সারাদেশের মানুষ। তারা অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সীমাহীন শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তির দাবি তোলেন। এরই ফলে সংঘটিত হয় উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান। অবসান ঘটে

সামরিক শাসনের। তবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন আরেক সামরিক শাসক। গণ-জোয়ারের চাপে তিনি বাধ্য হন সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করতে। ১৯৭০ সালের এই নির্বাচনে দেশের দুই অংশের মধ্যে বাঙালিরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা রাজি ছিল না বাংলাদেশ ভূখণ্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে। তাই তারা শুরু করল ক্ষমতা হাতবদলের নানা টালবাহানা ও দৃশ্য-অদৃশ্য নাটক। ফলে, আবারও রাজপথে নেমে এলেন মুক্তিকামী বাঙালি জাতি। এরই ফাঁকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আকাশ ও সমুদ্র পথে আসতে থাকে হাজার হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। পশ্চিম পাকিস্তান স্পষ্টতই এগিয়ে যায় এক রক্তক্ষয়ী ভয়ংকর যুদ্ধের দিকে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস আন্দোলনে, প্রতিরোধে এবং অধিকার আদায়ের মিছিল-সমাবেশে সারাদেশ হয়ে ওঠে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। স্বায়ত্তশাসন নয়, বাঙালি জাতি চেয়ে বসল– 'আর নয়, অনেক হয়েছে, এবার চাই স্বাধীনতা'। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল আক্রমণের একটা বাহানা– দেশদ্রোহিতার প্রমাণ চাই তাদের। তাই নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্যাঙ্ক, কামান, মেশিনগান নিয়ে। বাঙালি বীরের জাতি। তারা ভয় না পেয়ে প্রতিরোধের জন্য ঘুরে দাঁড়ালো যার যা ছিল, তাই নিয়ে। স্বাধীনতার এই সর্বগ্রাসী জনযুদ্ধে সামরিক বাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, আনসারের পাশাপাশি অস্ত্র হাতে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাত্র, জনতা, কৃষক, শ্রমিক, কিশোর ও নারীরাও। অবশেষে এক নদী রক্ত ঝরিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর এলো সেই মহাক্ষণ– বাঙালির সমগ্র ইতিহাসে যথার্থ স্বাধীনতা, প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজয়।

১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বছর, স্বাধীনতার বছর, বিজয়ের বছর। এই যুদ্ধে বাঙালি হারিয়েছে অসংখ্য প্রাণ, আহত হয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষ, স্বজনহারা হয়েছে অগণিত প্রিয়জন। এসব ঘটনার ব্যাপকতা সীমাহীন। এর সূচনা ১৯৪৭ সালেই; পরিণতি পেতে সময় লেগেছে দীর্ঘ ২৪ বছর। তাই এর সঙ্গে তুলনা হয় না কোনো কিছুর। এই অর্জন মিশে আছে বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের সঙ্গে।

জেন-জি প্রজন্ম ও বিজয় দিবস: বাঙালির ইতিহাসের গতিধারা চিরকালই ছিল কণ্টকাকীর্ণ। ভালো কোনো কিছুই তাদের জীবনে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। বাঙালির দুর্ভাগ্য, সকল যুগে নিজেদের মধ্যেই ছিল অসংখ্য মীরজাফর আর জগৎ শেঠের মতো বিশ্বাসঘাতক। আমরা বেদনার্ত চিত্তে লক্ষ করি, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আমরা অর্জন করতে পেরেছিলাম। কিন্তু যে স্বপ্ন আমাদের পূর্বসূরিরা হৃদয়ে লালন করে যুদ্ধ করেছিলেন, অকাতরে দিয়েছিলেন প্রাণ, সে স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে বার বার। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে স্বাধীন দেশেই নতুন রূপে অপশাসন, দুর্বৃত্তায়ন, অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে নেমে আসতে হয়েছিল এ দেশের জনগণকে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য যারা বার বার লড়াই করেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন ছাত্র ও যুবসমাজ। এরা মহান মুক্তিযুদ্ধেও ছিলেন সম্মুখ সারিতে। দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সবশেষ প্রতিরোধ সংগ্রামে সারাদেশের রাজপথ কাঁপিয়েছিলেন আমাদের নতুন প্রজন্মের যুব-তরুণ ও কিশোর, যাদের আন্তর্জাতিক পরিচয় 'জেন-জি'। এদের নেতৃত্বে আস্থা রেখে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন দল ও মতের

মানুষ। এমনকি, মুক্তিকামী অসংখ্য সাধারণ মানুষও নেমে আসেন রাজপথে। কোটা ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পথ ধরে যে বিপ্লবের সূচনা, স্বৈরাচার পতনের মাধ্যমে এক নতুন সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন জাগিয়ে তার সফল পরিণতি।

এই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পাকিস্তান পর্বের নির্যাতন-নিপীড়নের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ সূচিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমৃদ্ধ মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা স্বীকার না করার বৈষম্য। বর্তমান আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয় চাকরি ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতির জন্য মেধাবী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যমান বড়ো ব্যবধান। পাকিস্তানিরা ছিলেন স্বৈরশাসক; বাংলাদেশের শাসকদেরও অনেকেই ছিলেন একই পথের যাত্রী। বিশেষত, বিগত প্রায় দুই দশকের শাসনব্যবস্থা ১৯৭১ সালে পূর্ববর্তী পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তারা বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেছিলেন নিজেদের স্বার্থে। প্রতিপক্ষকে দমন ও নির্মূল করার জন্য বাস্তবায়ন করা হয়েছিল সবরকম পরিকল্পনা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তৈরি করা হয়েছিল দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এবং প্রস্তুত করা হয়েছিল বিরোধী পক্ষকে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে। সবশেষে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমনের উদ্দেশে জল, স্থল ও আকাশ থেকে যেভাবে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে, তা পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। গুম ও গুপ্তহত্যার মাধ্যমে যা করা হয়েছে, তা কোনো সভ্য দেশের ইতিহাসে সংঘটিত হয়েছিল কি না সন্দেহ। এমন একটা দানবীয় ব্যবস্থাকে 'জেন-জি' প্রজন্ম মুখোমুখি প্রতিরোধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছত্রিশ দিনের আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরশাসক ও স্বৈরশাসনের অবসানের ফলে সারাদেশে মানুষের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, তার সাথে তুলনা চলে কেবল ১৯৭১ সালের ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের। এই দুই বিজয়ের দিনে একইভাবে হাজার হাজার মানুষ বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। এ কারণে ৫ই আগস্টকে অনেকে বলেন 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা','দ্বিতীয় বিজয়'।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সহস্রাধিক করুণ মৃত্যু ও হাজার হাজার আহতদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে জুলাই যোদ্ধারা এ দেশের মানুষকে আরও একবার স্বাধীনতার আনন্দ নতুন করে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পরে এটাই সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব। জেন-জি প্রজন্মের অবিস্মরণীয় অবদান জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে চিরকাল। ১৯৭১ সালে বাঙালির নিজস্ব দেশ ছিল না। তাই সেই আন্দোলন ও সংগ্রামের ব্যাপকতা অনেক গভীর। তখন বাইরের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের একটা দেশ তৈরি করে নিতে হয়েছে। কাজটা মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল দীর্ঘ ২৩ বছর। অবশেষে ২৪তম বছরব্যাপী সর্বাত্মক সশস্ত্র যুদ্ধ। তাই একে ছোটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ২০২৪-এর জুলাই বিপ্লবকেও অবমূল্যায়ন করার উপায় নেই। উভয় ক্ষেত্রে লড়াই করতে হয়েছে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে। একাত্তরে ছিল দুই পক্ষই সশস্ত্র, জুলাই বিপ্লবে 'জেন-জি'রা ছিলেন নিরস্ত্র। ১৯৭১-এর বিজয়ে আমরা পেয়েছি একটা দেশ। পক্ষান্তরে, ২০২৪-এর বিজয়ে লাভ করেছি স্বৈরাচার মুক্ত নতুন এক বাংলাদেশকে। এখন শুরু হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিশোধনের মূল কাজ। দেশের সর্বত্র বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, ঐক্যবদ্ধ জাতি এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে নতুন করে। ১৯৭১ সালে আমরা যে দেশ পেয়েছিলাম, ২০২৪-এর 'জুলাই বিপ্লব' আমাদেরকে দিয়েছে সেই দেশকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার অভয় ও প্রত্যয়। বিপ্লব-উত্তর বাংলাদেশে 'জেন-জি' প্রজন্ম। এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে– মহান 'বিজয় দিবসে' তাদের কাছে জাতির সেটাই প্রত্যাশা।

ড. মো. নাজমুল হক: অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, nazmulbrurbn@gmail.com

২য় প্রজন্মের অটোমেটেড মিউটেশন সিস্টেম ২.১ এবং মোবাইল অ্যাপ 'ভূমি' উদ্বোধন

২৪শে নভেম্বর রাজধানীর ভূমি ভবনের সেমিনার হলে 'অটোমেটেড মিউটেশন সিস্টেম ২.১ ও ভূমি সেবার ইন্টিগ্রেটেড মোবাইল অ্যাপ 'ভূমি' উদ্বোধন এবং ভূমি সেবা সিস্টেমে জয়পুরহাট জেলার শতভাগ খতিয়ান ও হোল্ডিং-এর নির্ভুল তথ্য উন্মুক্তকরণ অনুষ্ঠানে ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেন, ভূমি মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এজন্য দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজন ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। এ লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় জনবান্ধব অটোমেটেড ভূমিসেবা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অটোমেটেড মিউটেশন সিস্টেম ২.১ চালুর মাধ্যমে ভূমিসেবায় হিউম্যান টাচ আরও কমিয়ে ফেলা হয়েছে। নামজারির জন্য নাগরিকদের মাত্র একবার উপজেলা ভূমি অফিসে আসতে হবে। এর মাধ্যমে জালিয়াতি করে নামজারি ও ভূমি হস্তান্তর প্রতিরোধ করা যাবে। ভূমিসেবায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে 'ভূমি' অ্যাপ, হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা । ভূমি অ্যাপ এর মাধ্যমে নাগরিক ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ও দাখিলা সংগ্রহ, নামজারির ফি প্রদান, ডিসিআর ও খতিয়ান সংগ্রহ এবং খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি ও মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করতে পারবেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভূমিসেবা ভূমি অ্যাপ এর মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। অনুষ্ঠানে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের ভূমিসেবার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: অর্ণব দাস

মুক্তিযুদ্ধের অনন্য উপন্যাস: *রাইফেল রোটি আওরাত*

ড. আশরাফ পিন্টু

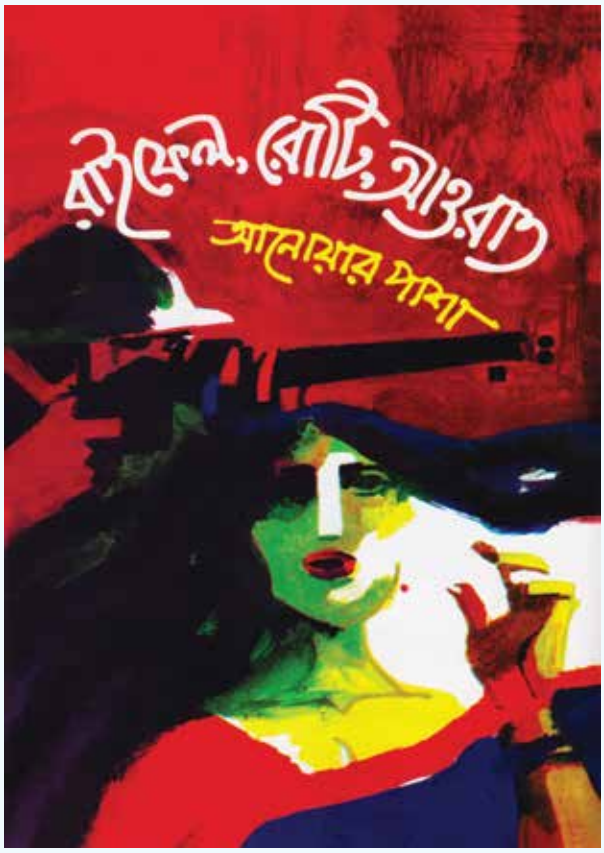

শহিদ বুদ্ধিজীবী আনোয়ার পাশা (১৫ই এপ্রিল ১৯২৮–১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১) রচিত *রাইফেল রোটি আওরাত* মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লেখা বাংলা সাহিত্যের একমাত্র উপন্যাস। এর রচনাকাল এপ্রিল থেকে জুন মাস। ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ বাঙালি জাতির উপর যে অমানুষিক হত্যাযজ্ঞ চালায়, উপন্যাসটি শুরু করেছেন তিনি সেই ২৫শে মার্চের ভোরের বর্ণনা দিয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে বসে একটি জাতির যুদ্ধজয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপন্যাস রচনার মতো কাজটি সহজ ছিল না। যে-কোনো সময় শত্রুরা এসে তাকে মেরে ফেলতে পারত। তবে তখন তিনি বিপদ মুক্ত হলেও পরে তাকে জীবন দিতে হয়েছে শত্রুদের হাতেই। তবুও যুদ্ধের ময়দানে বসে যুদ্ধের প্রথম তিন মাসেই তিনি লিখে ফেলেছিলেন এই অমূল্য দলিলটি– যেখানে রয়েছে বাঙালি জাতির শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন এবং তার থেকে মুক্তি ও যুদ্ধ জয়ের প্রেরণা।

উপন্যাস হচ্ছে বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ বাস্তবজীবনের সম্ভাব্য ঘটনাবলিকে যখন লেখক কল্পনার রঙে রাঙিয়ে সুনির্বাচিত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেন, তখনই তা উপন্যাসের পদবাচ্য হয়ে ওঠে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে– লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনি অবলম্বনে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয় তাকে উপন্যাস বলে। উপন্যাসের সংজ্ঞা ও কাহিনি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা রয়েছে *রাইফেল রোটি আওরাত*-এ তেমন সংজ্ঞায়িত কাহিনি নেই। তবু কাহিনি তো একটা রয়েছেই। উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্তর স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সূত্রে আমরা খণ্ড খণ্ড অনেক কাহিনি জানতে পারি– যার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক বিশাল কাহিনি। এই কাহিনির আকাশে ভেসে ওঠে– আব্দুল মালেক, আব্দুল খালেক, সোবহান মৌলবী, গাজি মাসউদ-উর-রহমান, হাসিম শেখ, করিমন বিবি, পলিভাবি, বুলাদী– এমনি অনেক চরিত্র। সকলেই একই অবস্থার শিকার। কিন্তু কত বিচিত্র তাদের প্রতিক্রিয়া। তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে একটা সাধারণ দ্বন্দ্বে; যার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে মানুষের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনসত্য– পশুশক্তির বিরুদ্ধে মানবসত্তার সংগ্রাম স্পৃহার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা।

এ উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্ত শাহীন লেখকের শিল্পীমনের এক অপূর্ব সৃষ্টি। এ চরিত্রকেই কেন্দ্র করেই উপন্যাসের মূল কাহিনি বিকশিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করেছে। উপন্যাসের প্রায় সব জায়গায় তার উপস্থিতি রয়েছে। অজস্র ঘটনা-উপঘটনার ভিড়ে সুদীপ্ত শাহীন হারিয়ে যায়নি। এ গল্পের নায়ক সুদীপ্ত শাহীন বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সংকল্প-প্রত্যয়েরই প্রতীক।

আব্দুল মালেক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপক, যিনি সমাজে বুদ্ধিজীবী হিসেবেও পরিচিত। স্বার্থপর এই ব্যক্তিটি পাকিস্তানের একনিষ্ঠ সেবক। প্রকৃতগত দিক দিয়ে তিনি একজন মিথ্যাবাদী ও ধুরন্ধর ব্যক্তি। সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই চরিত্রটি গড়ে উঠেছে। তার ভাই ড. আব্দুল খালেকও একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী তিনি। তিনি তার ভাই আব্দুল মালেকের চেয়েও বেশি ধুরন্ধর ও কপটচারী। শুধু কপটচারীই নন, তিনি একজন হীনমানসিকতার ব্যক্তিও; তার প্রমাণ মেলে তিনি যখন নারী অপহরণকারী পাকসেনাদের সাফাই গেয়ে বলেন, 'আর্মির জেনারসিটি দেখুন, মেয়েদের ফেরত পাঠাবার সময় সঙ্গে চিকিৎসার জন্য তিনশো টাকাও দিয়েছে। দে আর কোয়াইট সেন্সিবল ফেলো।'

সোবহান মৌলবীর অন্তর ধর্মের পরিচয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। তিনি একজন গোঁড়া ও সুবিধাবাদী চরিত্রের মানুষ। ধর্মকে ব্যবহার করে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে। এই ভণ্ড, কাপুরুষ মিথ্যেবাদী জালিয়াতের চরিত্রটি লেখক নিপুণভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

এ উপন্যাসের দুটি উজ্জ্বল চরিত্র হলো হাসিম শেখ ও মহি উদ্দিন ফিরোজ। হাসিম শেখ সামান্য পুলিশ কর্মচারী কিন্তু তার

দেশপ্রেম অত্যন্ত গভীর। তিনি সাহসী এবং সংকল্পও অতি দৃঢ়। মহি উদ্দিন ফিরোজ রাজনীতি করেন বটে, রাজনীতি তেমন বোঝেন বলে মনে হয় না। তবে তিনি একজন সত্যিকারের সহৃদয় ব্যক্তি–সদালাপী ভদ্রলোক।

আলোচ্য উপন্যাসে ২৫শে মার্চের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তার কথা এসেছে। এসেছে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর। এ উপন্যাসে অনেকগুলো নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে; এর মধ্যে কয়েকটি চরিত্র স্বল্প পরিসরে হলেও সেগুলো চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে এবং স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমেনা বেগম এমনি একটি চরিত্র; যিনি ভাবাবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি সংকটময় পরিস্থিতিকে তড়িৎ সিদ্ধান্তে পারদর্শিনী। তার কর্তব্যনিষ্ঠা, ধীরস্থির স্বভাব উপন্যাসের বিস্তৃত বক্ষপটে তার স্বচ্ছন্দ পদচারণা এবং নারীসুলভ নমনীয়তা তাকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

পলিভাবি এ উপন্যাসের একটি ট্র্যাজিক চরিত্র। তিনি শিল্পী আমানের স্ত্রী। তার বুক থেকে তিন বছরের শিশুকন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে পাকসেনারা যখন চোখের সামনে হত্যা করে, সেই মুহূর্তে তিনি শপথ নিয়েছিলেন– অন্তত একটি পাঞ্জাবি অফিসারকে হত্যা করতে হবে। জীবন দিয়েও তিনি রক্ষা করেছিলেন তার প্রতিজ্ঞা।

উপন্যাসের একেবারে শেষে বুলাদী এসে দেখা দিয়েছে। প্রথম সাক্ষাতে আমরা তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই না; দেখতে পাই একটা রহস্যের ঘেরাজালে তিনি বাস করছেন। ক্রমান্বয়ে সে রহস্যের আবহাওয়া কাটতে থাকে এবং সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো বুলাদীর ব্যক্তিত্ব পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি গোপনে কমুনিস্ট পার্টির একজন সদস্য; প্রকাশ্যে জামায়াতে ইসলামের সমর্থক শিক্ষিকা। শুধু রাজনৈতিক কারণেই তার প্রতি পাঠকের আকর্ষণ নয়; তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ দায়িত্ববোধ, বুদ্ধিদীপ্ত ও পরিহাসকুশল বাক্যালাপ– এসবই মোহিত করে। এই চরিত্রটি লেখক অত্যন্ত দরদ দিয়ে অনন্য শিল্প মহিমায় চিত্রিত করেছেন।

কথাশিল্পী আনোয়ার পাশা *রাইফেল রোটি আওরাত* উপন্যাসে বাঙালি জাতির এক দুর্যোগঘন ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীনের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিচারণের মাধ্যমে লেখক উপন্যাসটিকে বর্ণনা প্রধান করে ফেলেছেন; তাই চরিত্র চিত্রণের সম্ভাবনা এখানে দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। তবে এ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলির একটা প্রশস্ত পশ্চাৎ ভূমি এঁকেছেন লেখক, যার সীমানা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। অথচ তিনি মুখ্যত ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত অবাধ বিচরণ করেছেন। সেদিনের সেই হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণের ভয়াবহ মুহূর্তগুলোকে লেখক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার তুলি দিয়ে নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন।

উপন্যাসটি বর্ণনা প্রধান হবার ফলে এর ভাষা কখনো ছন্দায়িত লালিত্য, আবার কখনো আবেগধর্মী হয়ে উঠেছে। যেমন: 'আমনের বুক ভরে ফুটল এক কথার সূর্যমুখী– আমরা বাঙালি, স্বাধীনতার সূর্যের দিকে উন্মুখ একটি ফুলের নাম– আমরা বাঙালি।' তবে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা প্রধান বিষয় তা হচ্ছে লেখক ঘটনার ঊর্ধ্বে উঠে ঘটনা সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকতে পেরেছেন। লেখকের এই সংযত ও সংহত মানসিকতার কারণেই উপন্যাসটি সার্থকতা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক আবুল ফজলের উক্তিটি স্মর্তব্য, আনোয়ার পাশার এই বই কোনো অর্থেই গদগদ বাক্যের পালা হয়নি। এ এক সংহত, সংযত নির্লিপ্ত শিল্পী মনেরই যেন উৎসারণ। চোখের সামনে ঘটা টাটকা ঘটনাবলির উত্তাপ তার শিল্পসত্তাকে কেন্দ্রচ্যুত করেনি কোথাও। লেখকের জন্য এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর হতে পারে না। উচ্চতর শিল্পকর্মের জন্য স্থান-কালের দূরত্বের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে; আশ্চর্য, আনোয়ার পাশার জন্য তার প্রয়োজন হয়নি। যথার্থ শিল্পী বলেই হয়ত তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ঘটনাকে ছাড়িয়ে পৌঁছাতে পেরেছেন ঘটনার মর্মলোকে। ঘটনার মর্মলোকে পৌঁছিতে পারাটা শুধু শিল্পীর শিল্প সচেতনতারই পরিচায়ক নয়, এটা শিল্পীর সমাজচেতনারও পরিচায়ক। তাছাড়া শিল্পীর জীবনচেতনাও তার এই শিল্প সৃষ্টির মধ্যে বিধৃত। আনোয়ার পাশার কাছে 'শিল্প' আর 'জীবন' দুটি অবিচ্ছেদ্য সত্তা। 'Art for life sake' – জীবনের মহত্তর রূপটি তার এই রচনায় বিধৃত হয়েছে।

ড. আশরাফ পিন্টু: বিভাগীয় প্রধান, বাংলা, মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বেড়া, পাবনা, ashrafpintu.sonon@gmail.com

ডেটা ব্যবস্থাপনায় দুই অধ্যাদেশ জারি

অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রতি ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা (Personal Data Protection) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা (National Data Governance) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে। এই অধ্যাদেশ দু'টির মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যক্তিগত উপাত্তের বা ডেটার গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও মালিকানা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রত্যেক নাগরিককে তার তথ্যের প্রকৃত মালিক হিসেবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যার ফলে উপাত্ত (ডেটা) সংগ্রহ, সংরক্ষণ, স্থানান্তর ও ব্যবহার করার পূর্বে তার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া সংবেদনশীল তথ্য (যেমন: আর্থিক, স্বাস্থ্য, জেনেটিক ও বায়োমেট্রিক) অতিরিক্ত সুরক্ষা পাবে এবং সুরক্ষার লঙ্ঘন ঘটলে প্রশাসনিক জরিমানা, ক্ষতিপূরণ, অর্থদণ্ড ও শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এ সকল বিষয় তদারকি করতে একটি উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করা হয়েছে। ৯ই নভেম্বর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এ তথ্য জানায়।

প্রতিবেদন: সাদমান সাকিব

শরণার্থী ৭১

ড. মোহাম্মদ আলী খান

জীবন বাঁচাতে এক দেশ থেকে অন্যদেশে মানুষের চলে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ও অমানবিক হলেও বাস্তবে পৃথিবীজুড়ে তা অব্যাহত আছে। বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে প্রায় ১১৭.৩ মিলিয়ন মানুষ শরণার্থী হিসেবে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। তবে সবাই শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পাননি, এই সংখ্যা প্রায় ৪২.৫ মিলিয়ন মাত্র।

বাংলাদেশকে বর্তমানে দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে হয়েছে। এই বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে দেশের সীমানা পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল শরণার্থী হিসেবে। ইতিহাসের পাতায় সে দুর্বিষহ দিন ও রাত্রির কথা লিপিবদ্ধ আছে। ইতিহাসের সে অমলিন পাতা থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যে অত্যাচার শুরু হয়, তা থেকে বাঁচতে লক্ষ লক্ষ বাঙালি তৎকালীন পূর্ববাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) সীমানা ঘেঁষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেন। এরা মূলত পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ পাড়ি দেন, এর ভেতর ছিল অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শিশু। বার্তাসংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস তখন লিখেছিল, শরণার্থীদের অনেকে ভারতে ঢোকার জন্য ৬০ থেকে ৭০ মাইল পর্যন্ত হেঁটেছেন। *নিউইয়র্ক টাইমসের* বর্ণনায় উঠে এসেছে অনেক ভয়াবহ চিত্র, অনেক শরণার্থী কংক্রিটের পাইপের ভেতর আশ্রয় নিয়েছেন যা পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য রাস্তার ধারে রাখা হয়েছিল।

শরণার্থীদের বেশির ভাগই ঘিঞ্জি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। বর্ষায় যেমন তারা ভিজেছেন তেমনি রোদে পুড়েছেন। খাবার পানির ছিল মহাসংকট, পয়ঃপ্রণালী বা টয়লেটের ব্যবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ১৯৭১ সালের স্মরণে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ যে ৭১টি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল তার কয়েকটিতে সে অবর্ণনীয় দুরবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

নিউইয়র্ক টাইমস ১৯৭১ সালে এক প্রতিবেদনে লিখেছিল, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭৫ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরায় ১৪ লাখের বেশি, মেঘালয়ে প্রায় ৭ লক্ষ, আসামে তিন লক্ষের বেশি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই শরণার্থীদের সকলেই ছিলেন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। অথচ খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির জন্য ছিল হাহাকার। মে ১৯৭১-এর বার্তাসংস্থা এপি'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের চাপে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর জনমিতি বদলে গেছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গানের ভুবনের একটি অংশ জুড়ে ছিল ১৯৭১-এর শরণার্থী। অ্যালেন গিন্সবার্গের রচনায় পাওয়া যায় তারই প্রতিধ্বনি, কী দুঃখ যাতনাময় ছিল সেই দিনগুলো। ১৪.১০.১৯৭১ সালে রচিত অ্যালেন গিন্সবার্গ (Allen Ginsberg)-এর 'September On Jessore Road'-এর সুদীর্ঘ গানের একটি অংশ নিম্নরূপ :

Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes
On Jessore Road-long bumboo huts
No place to shit but sand channel ruts.
Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters nowhere to go...

লক্ষ লক্ষ শিশু, তাকিয়ে আকাশের দিকে
ঢোলা ফাঁপা পেট নিয়ে দেখছে বড় বড় চোখ মেলে
যশোর রোডের পাশে বাঁশের ছাউনি
শুধু বালি ছাড়া মলত্যাগের জন্য কোন জায়গা নেই।

লক্ষ লক্ষ পিতা ভিজছে বৃষ্টি ধারায়
লক্ষ লক্ষ মা কাতরাচ্ছে ব্যথায়
লক্ষ লক্ষ ভাই ভাসছে দুঃখ-বেদনায়
লক্ষ লক্ষ বোনের নেই এতটুকু আশ্রয়...
(ভাবানুবাদ: মোহাম্মদ আলী খান)

গিন্সবার্গ (১৯২৬-১৯৯৭) প্রথমে কবিতাই লিখেছিলেন, পরে এতে সুর দেওয়া হয়েছে। অ্যালেন গিন্সবার্গের নিজের কথায়:

খুব ভোরে ব্যাগ নিয়ে রওনা দিলাম বেনাপোল। যা দেখলাম অবর্ণনীয়। আমরা পশ্চিমারা দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি, কিন্তু যুদ্ধের কারণে সাধারণ মানুষের এমন মর্মস্পর্শী ও বেদনাদায়ক চিত্র আগে কখনো দেখিনি। আমি সাদা চামড়া, আমাকে দেখে শরণার্থীরা এগিয়ে এল সাহায্যের আশায়। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারছিলাম না।...

কবিতায়ও এসেছে সেই শরণার্থী জীবনের দুঃসহ জীবনের কথা। যেমন :

এরা কী তীর্থযাত্রী, দেবতার ক্রীতদাস
পুন্যার্থী নারী ও পুরুষ?
এ কি তবে দুঃখ বিলাসী রোদে
আলোকের অভিসারী
লক্ষ কোটি মানুষের ব্যথিত মিছিল?
(শরণার্থী)
অথবা
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো,
আমি বিষপান করে মরে যাবো!...
(যদি নির্বাসন দাও)

বহু দুঃখ-দুর্দশা,অনাহার-অপুষ্টি আর অসুস্থতাকে মেনে কোটি বাঙালির শরণার্থী হয়ে; ভারতে আশ্রয় নেওয়ার দিন শেষ হয় ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশ নামে নতুন স্বাধীন দেশের অভ্যুত্থানের সাথে সাথে। তবে সবাই ঐদিন জন্মভূমির মাটিতে ফিরে আসতে পারেননি। শরণার্থীদের সর্বশেষ দলটি বাংলাদেশে ফিরে আসেন ২৫শে মার্চ ১৯৭২ সালে। এই দলে ছিলেন প্রায় ৪ হাজার শরণার্থী। এইভাবে ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে এই শরণার্থীদের নিয়ে ভারত একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে, মূল্য ছিল পাঁচ পয়সা। এটি ছিল ডেফিনেটিভ ডাকটিকিট।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০শে জুন ২০২১ সালে অবমুক্ত করে একটি স্মারক ডাকটিকিট। এজন্য একটি উদ্বোধনী খামও প্রকাশিত হয়েছে। স্মারক ডাকটিকিটের মূল্য ছিল ১০ টাকা, শরণার্থীদের দুর্বিষহ জীবনের একটি ছবি এখানে ফুটে উঠেছে।

ড. মোহাম্মদ আলী খান: লেখক, গবেষক ও সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক মেডলগের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল (পিআইটিসি) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে অভ্যন্তরীণ লজিস্টিকসে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান সুইজারল্যান্ডভিত্তিক মেডলগ-এর একটি কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৭ই নভেম্বর রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২২ বছর মেয়াদি এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস.এম. মনিরুজ্জামান এবং মেডলগ বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এটিএম. আনিসুল মিল্লাত তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহণ উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম. সাখাওয়াত হোসেন।

অনুষ্ঠানে নৌপরিবহণ উপদেষ্টা বলেন, বন্দর ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে আজ একটি স্মরণীয় দিন। ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে ঢাকার কাছে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনালের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তিটি বাংলাদেশের লজিস্টিক ও বাণিজ্য অবকাঠামো উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। এটির মূল সুফলভোগী হবে মূলত আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যারা একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছে। আজকের এই বিনিয়োগ আমাদের স্বপ্নবান তরুণ প্রজন্মের জন্য। বাংলাদেশের লজিস্টিক খাতের ভবিষ্যৎ বদলে দেবে মেডলগ টার্মিনাল চুক্তি।

এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যে সহায়তা দেওয়ার জন্য মেডলগ টার্মিনালের সুবিধাগুলো বাড়াবে এবং এখানকার বার্ষিক হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ১ লাখ ৬০ হাজার টিইইউয়ে উন্নীত করবে।

প্রতিবেদন: আহনাফ হোসেন

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি

ড. শিহাব শাহরিয়ার

দিনটির কথা মনে নেই। মনে আছে সময়টির কথা। সম্ভবত অগ্রহায়ণের মিঠে রোদের সকাল। সাল ১৯৭১। আমার জন্ম ১৯৬৫ সালের মার্চের কোনো এক ক্ষণে, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল সাড়ে ছয় বছরের মতো। আমার দাদার বয়স তখন ১০০ ছুঁই ছুঁই করছে। দাদিও ৮০ পেরিয়েছে। ঐ দিন আমরা তিন অসহায় ব্যক্তি ছাড়া যৌথপরিবারের বাকিরা আমাদের চরখারচর সাতানী গ্রাম থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী বেতমারি গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারণ বেতমারি গ্রামটির তিন দিকেই জলাশয়, ওখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর যাবার কোনো উপায় নেই। তারা প্রত্যন্ত গ্রামে যায় না, বিশেষ করে নদী পার হয়ে চরাঞ্চলে যায় না, যাবে না। ঐ দিন খুব ভোরে জানা গেল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নরপশুরা ব্রহ্মপুত্র পাড়ের আমাদের নিবিড় গ্রামে আসছে। সেই হায়েনা সৈনিকদেরকে নিয়ে আসছে জামালপুরের নান্দিনার কয়েকজন রাজাকার ও আলবদর এবং আমাদেরই গ্রামের পিস কমিটির সদস্য জসীরউদ্দীন কেরানি ও আবুল কাসেম মাস্টারের মাধ্যমে। অপরাধ– আমার মামা ও চাচা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তারাই তাদের সহযোদ্ধাদেরকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। আমাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা কেন আসে? আমার আব্বা শহীদুল্লাহ মাস্টার কেন তাদের আসতে দেন? কেন যখন-তখন এসে খাওয়াদাওয়া করে আবার অপারেশনে চলে যায় অর্থাৎ আমার বাপ-চাচারা কেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করছে?

আস্তে আস্তে গ্রামের সব মানুষই জেনে যায় খবরটা। কেউ কেউ আমার আব্বার কাছে আসে– এই পরিস্থিতিতে কী করা যায়, পরামর্শ নিতে। আব্বা তাদেরকে বলে দেন, গ্রাম ছেড়ে কিছু সময়ের জন্য অন্যত্র যাবার প্রস্তুতি নিতে। ধীরে ধীরে বেলা

বাড়ে। দাদা, দাদি এবং আমার জন্য বাড়ির পাশে বাংকারের মতো গর্ত করে, গর্তের ভেতর পাটি বিছিয়ে সেখানে বসার ব্যবস্থা করা হয়। আর গর্তের ওপর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সামান্য ফাঁক রেখে আম এবং কাঁঠালের ঘন পাতাযুক্ত ডাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। আমরা বেলা আনুমানিক এগারোটার দিকে খাওয়াদাওয়া করে মাটির বাংকারে ঢুকে গেলাম। বাকিরা দলেবলে গ্রাম ছাড়তে শুরু করল। কিছু দূর যাওয়ার পর তারা জানতে পারল– পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা আর আসছে না। না আসার কারণ, তারা ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে ঢুকবে না। ঢুকলে মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণ হতে পারে। ফলে তারা নান্দিনা থেকেই ফিরে যায়।

আমাদের বাড়ির সবাই ফিরে আসে এবং দাদা, দাদি ও আমাকে মাটির গর্ত বা বাংকার থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। মাত্র কিছুক্ষণ অন্ধকারে থেকে সূর্যের আলোতে এসে মনে হলো পৃথিবী কত সুন্দর। এই রৌদ্র-হাওয়া, মেঘমল্লার, এই নৌকা-নদী, সবুজ-শ্যামল মাটি, ফুল-পাখিদের কলরব, হা-ডু-ডু, বৌচি, তেলের পিঠা, কবুতরের ডাক, মধ্য-দুপুরে শ্যাওড়া গাছের নীচে শুকনো মচমচে পাতা পাড়ানো, হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় 'বাক্‌বাকুম পায়রা, মাথায় দিয়ে টায়রা' মুখস্থ করা আর সন্ধ্যারাতে মায়ের কোলে ঢুলুঢুলু চোখে ঘুমিয়ে পড়া? আহা! কী যে মধুর, কী যে প্রিয় মাটি, বলি কেমন করে? তখন বুঝিনি কে লিখেছে: 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি'। তাহলে এমন দেশকে কেন পুড়িয়ে দেবে তারা? তারা কারা? বিদেশি হায়েনারা।

আমাদের গ্রামকে একাত্তরে পুড়িয়ে দিতে পারেনি। পুরো নয় মাস আমরা যুদ্ধের অনেক কিছু দেখেছি। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি আম্মার মামাতো ভাই লেবুমামা তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছে। সম্ভবত ২০ থেকে ২২ জন হবে। আম্মা-চাচিরা বড়ো বড়ো পাতিলে ভাত-তরকারি রান্না করছে। সারারাত রান্নাবান্নার প্রস্তুতিও নিয়েছে। কিন্তু রাঁধতে সয়, বাড়তে সয় না অবস্থা অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা মামাদের পেটে এত ক্ষুধা যে, রান্না শেষ হওয়ার তর সইছে না। তারা এক এক করে আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে মূলাক্ষেতে বেড়া টপকিয়ে যাচ্ছে আর মূলা তুলে কড়কড় করে খাচ্ছে। এসময় তারা তাদের যুদ্ধাস্ত্রগুলো বৈঠকঘরের সামনে রেখে দিয়েছে। আমরা ছোটোরা হাজারও কৌতূহল নিয়ে সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি আর জানতে চাইছি কোনটার কী নাম। মামা এসে একটা একটা করে অস্ত্র হাতে নিয়ে তার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, 'এটা লম্বা এটার নাম রাইফেল, এটা স্টেইনগান, এটা কামরাঙ্গার রঙের মতো এটা গ্রেনেড'। এরপর আমরা হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলাম।

বাড়ির সামনের আঙিনায় পাটি অথবা চট বিছিয়ে দেওয়া হলো– সেখানে সবাই সারিবেঁধে বসলেন। গরম ভাত, মাছ-মাংসের তরকারি দিয়ে তাদেরকে খেতে দেওয়া হলো। তারা খুবই তৃপ্তি সহকারে খেলেন। খাওয়া শেষ করে যার যার অস্ত্র সেই সেই নিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে খোলা মাঠ ও আকাশের দিকে কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমরা দৌড়ে গিয়ে গুলির খোসাগুলো কুড়াবার জন্য হুমরি খেয়ে পড়লাম। পিতল রঙের আঙুলের সাইজের কয়েকটি খোসা

আমরা কুড়িয়ে পেলাম। পেয়ে আমাদের মধ্যে কী যে আনন্দ, তা বুঝানো মুশকিল। খোসাগুলো বাড়িতে এনে রেখে দিলাম। এরপর শুরু হলো আমাদের বন্দুক বন্দুক খেলা।

আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে ছিল সারি সারি অনেকগুলো কলাগাছ। আমরা সমবয়সিরা বাড়ি থেকে দা নিয়ে কলাগাছের ডাটা কেটে সেটি দিয়ে রাইফেলের মতো বন্দুক বানিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো পজিশন নিয়ে, কখনও ক্রলিং করে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু করলাম। সে এক অন্যরকম আনন্দ। স্কুলও বন্ধ। কাজেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ছাড়া আর কি-ই-বা করার আছে?

এর কিছুদিন পর। শীত পড়েছে গ্রামে। একদিন সন্ধ্যায় দেখলাম আমাদের বাড়ির উত্তর পাশ দিয়ে কয়েকজন লোককে হাত বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা। আব্বা বললেন, ওরাই হচ্ছে রাজাকার। ওরাই আমাদের মতো মানুষদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে সোপর্দ করে অর্থাৎ তুলে দেয়। আর হানাদাররা চোখ বেঁধে নদী অথবা ঝিলের পাড়ে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গুলি করে মেরে ফেলে। সারা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে তারা মেরেছে। শুধু মানুষ মেরেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, অসংখ্য বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। আর অন্যদিকে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা চতুর্দিক থেকে যুদ্ধ করে হানাদার বাহিনীকে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত করছে। আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এত খবর কীভাবে পান'? তিনি বললেন, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং বিবিসি রেডিও-র মাধ্যমে'।

একদিন আব্বা একটি রেডিও সেট কিনে আনলেন। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির উঠোনে আশপাশের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকসহ সকলেই গোল হয়ে বসে বিবিসি'র খবর শুনলাম। পরের দিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র। আরেক দিন আকাশবাণী। প্রণবেশ সেন ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর। তৈরি হলো আমাদের কান। দেখতাম খবরের সময় হলেই গ্রামের অনেক মানুষ ছুটে আসছে আমাদের বাড়িতে। খবর পরিবেশনের সময় কেউ টু-শব্দ পর্যন্ত করতেন না। একসঙ্গে বসে খবর শুনতে ভালোই লাগত আমাদের।

আমার আব্বা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। দেশ-রাজনীতি এবং ইতিহাসের ভালোই খোঁজখবর রাখেন। পাকিস্তানি দুঃশাসনের অনেক কথাই বললেন– কিন্তু আমি ততটা বুঝিনি। বোঝার বয়সও হয়নি। তবে পাকিস্তানিরা যে খারাপ এটা কিছুটা বুঝতে পেরেছি। এদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে দেশকে মুক্ত করতে হবে এমনটাই আব্বা সেদিন সবাইকে বলতে চেয়েছেন।

একদিন ঘুম থেকে উঠে শুনি গুড়ুম গুড়ুম শব্দ আর দেখি বাড়ির উপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে বিমান যাচ্ছে। ভয় পাচ্ছিলাম। আব্বা বললেন, এগুলো যুদ্ধ বিমান। রাশিয়া আর ভারত আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছে। তারাই বাংলাদেশ স্বাধীন করতে সহায়তা দিচ্ছে। হঠাৎ পর পর তিনটি বিকট আওয়াজ পেলাম। দুই হাত দিয়ে কান বন্ধ করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম সবাই। পরে জানা গেল তিনটি শেল ফেলা হয়েছে– জামালপুর শহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে। শেল পড়ে বিশাল পুকুর হয়ে গেছে। জামালপুর শত্রুমুক্ত হলে একদিন আব্বার কাঁধে উঠে সেই শেল পড়া পুকুর তিনটি দেখতে গিয়েছিলাম। একটি পড়েছে ক্যাম্পের পাশ ঘেঁষে। পুকুর দেখার পর ঐ ক্যাম্প দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি, অসংখ্য হলুদ খামের চিঠি, হাতঘড়ি, কাপড়চোপড়, ট্রাংকসহ অনেক কিছু পাক-আর্মিদের জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। কেউ কেউ স্তূপের ভেতর কী জানি খোঁজাখুঁজি করছে।

সেদিন ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১। শেরপুর মুক্ত হওয়ার দিন। পড়ন্ত বিকাল সম্ভবত। আমাদের বাড়ির সামনে একটার পর একটা গুলির শব্দ হচ্ছে। সমস্বরে আওয়াজ আসছে– বিজয় ধ্বনি। সকলেই বেরিয়ে এলাম। যাদের আওয়াজ, দেখলাম কমান্ডার মামাসহ তার সহযোদ্ধারা। তাদের হাতে স্বাধীন পতাকা। বিজয়ের আনন্দে তারা উন্মাতাল। মুহূর্তের মধ্যেই তাদের সঙ্গে শত শত মানুষ যোগ দিলো। দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেখলাম বীর যোদ্ধারা মাটিকে ভক্তি করছে, কেউ কেউ সেজদা করছে। সে এক অন্যরকম অসাধারণ আনন্দ-দৃশ্য। সেই আনন্দ-দৃশ্য আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন, চির ভাস্বর হয়ে আছে। ম্লান হয়নি, হবেও না কোনোদিন। কারণ সে বিজয় ভুলবার নয়। সে বিজয় রক্ত দিয়ে কেনা। সে আনন্দ রক্তক্ষয়ী নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বহু কাঙ্ক্ষিত বিজয় ও স্বাধীন হবার আনন্দ। সার্বভৌম স্বদেশ পাওয়ার আনন্দ। রক্তে কেনা লাল-সবুজের পতাকা পাওয়ার আনন্দ। এই আনন্দে মিশে আছে আমার আব্বার সহযোগিতার হাত, আমার আম্মার সহযোগিতার হাত।

ড. শিহাব শাহরিয়ার: সাহিত্যিক ও সাবেক কিপার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

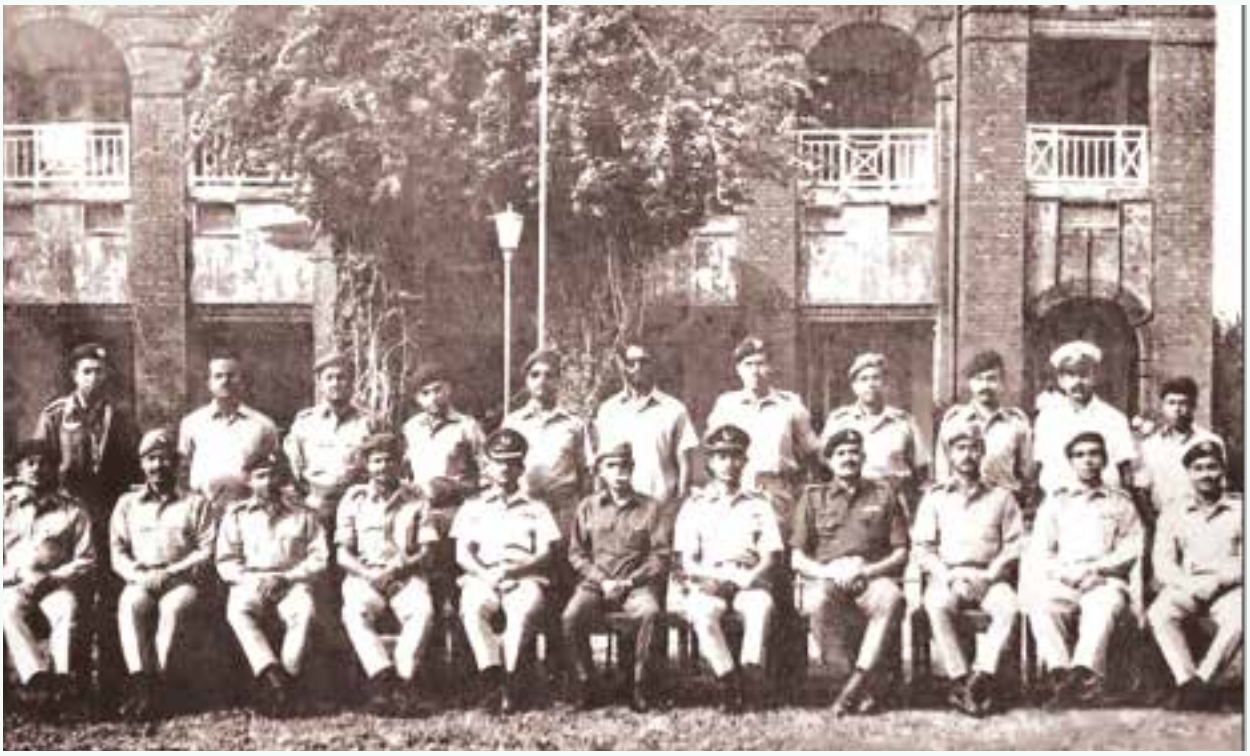

বিজয় দিবস ২০২৫: স্বাধীনতার পথে সংগ্রাম অর্জন ও ভবিষ্যতের প্রত্যয়

ড. সুলতানা আক্তার

১৬ই ডিসেম্বর– একটি দিন, যা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে মর্যাদাবহ ও গৌরবময় দিন। ১৯৭১ সালের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, অসংখ্য প্রাণের উৎসর্গ, লাখো মানুষের ত্যাগ ও দেশপ্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল এই দিন। বিজয় দিবস তাই শুধু একটি ক্যালেন্ডারভুক্ত দিবস নয়; এটি আমাদের জাতিসত্তার ভিত্তি, আমাদের আত্মমর্যাদার প্রতীক। ২০২৫ সালে এসে এই দিবসের গুরুত্ব আরও বেড়েছে– নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, জাতীয় মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নতুন করে ভাবার প্রেরণা হিসেবে। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পর বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রা এবং সংস্কৃতির সৃজনশীল বিকাশে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। কিন্তু এই অর্জনের মধ্যেও আমাদের মনে রাখতে হবে– স্বাধীনতার চেতনা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন আমরা আমাদের ইতিহাস, দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন হই।

ভাষা আন্দোলন: জাতিসত্তার ভিত্তি

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে প্রথমবার এক সুসংগঠিত জাতিসত্তার পথে দাঁড় করায়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি শুধু ভাষার প্রশ্ন ছিল না; ছিল সাংস্কৃতিক অধিকার ও রাজনৈতিক আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারদের রক্তস্নাত ফেব্রুয়ারি বাঙালিকে ঐক্যের বার্তা দেয়।

ছয় দফা: রাজনৈতিক মুক্তির রূপরেখা

১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দেয়। এটি ছিল একটি কার্যকর, বাস্তবভিত্তিক এবং স্বাধীনতার পূর্বশর্তস্বরূপ কাঠামো। পাকিস্তানি শাসকেরা ছয় দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' আখ্যা দিলেও মানুষের মন জয় করে নেয় এই দাবিগুলো।

১৯৭০ নির্বাচন ও গণরায়

বাঙালি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি, বৈষম্যমূলক মনোভাব এবং ষড়যন্ত্র আবারও বাঙালিকে বঞ্চনার মুখে ঠেলে দেয়।

গণহত্যা, প্রতিরোধ ও বিজয়ের পথ

২৫শে মার্চ ১৯৭১– কালরাত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিকল্পিত গণহত্যা চালায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। অপারেশন সার্চলাইটের নৃশংসতা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়। গণহত্যার মধ্যেও বাঙালি মাথা নত করেনি; বরং শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ।

স্বাধীনতার রূপরেখা

১০ই এপ্রিল ১৯৭১ গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধকালীন বা অস্থায়ী সরকার এবং ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলায় এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণমন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদকে নিয়ে গঠিত এ সরকার মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক নেতৃত্ব প্রদান করেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও জনগণের ত্যাগ

মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র যুদ্ধ, গেরিলা অভিযান, কৌশলগত প্রতিরোধের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীকে বারেবারে বিপর্যস্ত করে। সীমান্তের বাইরে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবির, সেক্টরভিত্তিক সংগঠন, বেসামরিক প্রশাসন এবং মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে যুদ্ধকে আরও সুসংগঠিত করে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ছিল এই যুদ্ধের প্রধান শক্তি– গৃহহারা মানুষ, নির্যাতিত নারী, উদ্বাস্তু, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী– সবাই মিলে বিজয় গড়ে তোলে।

আন্তর্জাতিক সহায়তা

বিশ্বের বিভিন্ন প্রগতিশীল রাষ্ট্র, গণমাধ্যম, মানবাধিকার সংগঠন এবং স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। পাকিস্তানি বাহিনী যখন লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করে, তখন ভারতের সক্রিয় ভূমিকা যুদ্ধকে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর অভিযানে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয়ের মুখে পড়ে।

১৬ই ডিসেম্বর: বিজয়ের মুহূর্ত

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ইতিহাসে এক অনন্য মুহূর্ত। ৯৩ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করে– যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এক বৃহত্তম আত্মসমর্পণ। বাংলাদেশ জন্ম নেয়– একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধ: ত্যাগের অনন্য ইতিহাস

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস ও বীরত্বময় অধ্যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী নিধন, প্রায় কোটি মানুষের গৃহহারা এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই জাতি অস্ত্র ধরেছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে।

এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, নারী, সাংবাদিক, শিল্পী– সবাই মিলেই গড়ে তুলেছিল এক অভূতপূর্ব প্রতিরোধ। মুক্তিযুদ্ধ শুধু সামরিক নয়; এটি ছিল সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং মানবিক ঘোষণা– বাঙালির আত্মমর্যাদা অমর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নতুন দিগন্ত পায়। তাঁর আহ্বান– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– জাতিকে এক সুসংহত সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

বিজয় দিবসের তাৎপর্য: স্মৃতি, দায়িত্ব ও পুনর্জাগরণ

১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় শুধু একদিনের ঘটনা নয়; এটি বছরের পর বছর বঞ্চনা, শোষণ ও সংগ্রামের পর এক নবজাগরণের মুহূর্ত। এই দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়–

• স্বাধীনতা কোনো দয়া নয়, অর্জিত অধিকার
• মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ আমাদের চিরঋণী করে রেখেছে
• স্বাধীনতার পথ রক্ষা করা প্রতিটি প্রজন্মের দায়িত্ব

বিজয় দিবস তাই স্মরণ, সম্মান এবং দায়িত্ববোধের সমন্বয়। শহিদদের রক্তে রাঙানো এই স্বাধীনতার চেতনা আমাদের জাতিকে এখনও পথ দেখায়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের যাত্রা ছিল চ্যালেঞ্জপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময়। রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হয়েছে শূন্য থেকে। আজ সাড়ে পাঁচ দশক পর বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চে এক উদীয়মান শক্তি–

• কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা
• ডেল্টা প্ল্যান, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেলসহ অবকাঠামোগত পরিবর্তন
• তথ্যপ্রযুক্তিতে তরুণদের অবদান
• নারীর অগ্রযাত্রা ও নেতৃত্বের বিকাশ
• স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় ক্রমোন্নতি
• রেমিট্যান্স ও শিল্পায়নে নতুন সম্ভাবনা

এ সমস্ত অর্জন প্রমাণ করে– যুদ্ধজয়ের মতোই শান্তিকালের বাংলাদেশও সংগ্রাম ও সৃজনশীলতায় অনন্য।

চ্যালেঞ্জ ও সংকট: ভবিষ্যৎ ভাবনার প্রয়োজন

অর্জন যতই হোক, বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিতে হলে কিছু মৌলিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা অপরিহার্য–

• সুশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান
• শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন
• জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ
• অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস
• প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ
• সামাজিক সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক চর্চার বিকাশ

এই চ্যালেঞ্জগুলো শুধু সরকারের নয়; এটি পুরো জাতির দায়িত্ব। আর সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের কাঁধে।

বিজয় দিবস ২০২৫: নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব ও প্রত্যয়

বাংলাদেশের অর্জনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে এবং স্বাধীনতার চেতনাকে ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে নতুন প্রজন্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ সালের প্রেক্ষাপটে তরুণসমাজ শুধু দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশই নয়– তারা প্রযুক্তি, জ্ঞান, উদ্ভাবন, নৈতিক মূল্যবোধ এবং বৈশ্বিক সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে নতুন মাত্রা দিতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে তাদের দায়িত্ব, সচেতনতা এবং দেশপ্রেমের ধারণাকে আরও গভীর করতে হবে।

১. মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস জানার দায়িত্ব

নতুন প্রজন্মের প্রথম দায়িত্ব হলো মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ও দলিলভিত্তিক ইতিহাস জানা।

• মুক্তিযুদ্ধের কারণ, প্রেক্ষাপট, গণহত্যা, মুজিবনগর সরকার, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা জরুরি।

• সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা অপপ্রচারমূলক উৎস থেকে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রমাণভিত্তিক বই, গবেষণা, দলিল, বক্তৃতা ও আর্কাইভ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

• ইতিহাস জানা মানে শুধু তথ্য জানা নয়– এটি মূল্যবোধ, মানবিকতা, দায়িত্ববোধ এবং নাগরিক চেতনার বিকাশ ঘটায়।

২. সত্য ও অসত্যের পার্থক্য করার ক্ষমতা তৈরি

ডিজিটাল যুগে তথ্যের বহমানতা যেমন আশীর্বাদ, তেমনি বিভ্রান্তিরও উৎস।

• ভুয়া তথ্য, ইতিহাস বিকৃতি, বিদেশি প্রপাগান্ডা বা চটকদার অপপ্রচার থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তরুণদের সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি (critical thinking) ও তথ্য যাচাই (fact-checking) শেখা প্রয়োজন।

• প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং অন্যদেরও সচেতন করা সমাজকে সুস্থ পথ দেখাতে সহায়তা করে।

৩. মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

বিজয়ের চেতনা মূলত মানবিকতার চেতনা।

• সমাজে দুর্বল, উপেক্ষিত, দরিদ্র কিংবা নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো প্রতিটি তরুণের নৈতিক দায়িত্ব।

• সামাজিক কর্মকাণ্ড, স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ, রক্তদান, দুর্যোগে সহায়তা, পরিবেশ রক্ষা– এসব কাজে অংশগ্রহণ তরুণদের পরিণত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

• সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা, ভিন্ন মতকে শ্রদ্ধা করা এবং বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াও প্রতিটি তরুণের দায়িত্ব ।

৪. জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ

২১ শতকের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে কেবল আবেগ নয়, প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা।

• জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, গবেষণা, ব্লকচেইন, সাইবার নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে পারদর্শিতা তৈরি করতে হবে।

• উচ্চশিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ দেশের উন্নয়নকে টেকসই করে।

• নতুন প্রজন্মের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শিল্প খাতে বিপ্লব ঘটাতে পারে।

৫. দুর্নীতি, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক অবস্থান

স্বাধীনতার চেতনা শুধু বাহ্যিক স্বাধীনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি নৈতিক ও ন্যায্য সমাজ গড়ার অঙ্গীকার।

• দুর্নীতি, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, জালিয়াতি, সাম্প্রদায়িকতা– এসবের বিরুদ্ধে তরুণসমাজকে উচ্চকণ্ঠ হতে হবে।

• সামাজিক মাধ্যম ও বাস্তব জীবনে সব ধরনের অসত্য, সহিংসতা বা ঘৃণার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া সময়ের দাবি।

• ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাস তৈরি হলে রাষ্ট্রশক্তি আরও গণমুখী ও মানবিক হয়।

৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা মানসিকতা

আজকের তরুণেরা শুধু চাকরিপ্রার্থী নয়, তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারীও হতে পারে।

• স্টার্ট-আপ কালচার, কৃষি উদ্যোক্তা, ই-কমার্স, পর্যটন, ডিজিটাল সেবা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন নতুন অর্থনৈতিক যুগের পথ দেখাচ্ছে।

• উদ্যোক্তা হওয়া মানে শুধু নিজের উন্নয়ন নয়; বরং সমাজে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।

৭. পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড়ো ভুক্তভোগী দেশগুলোর একটি।

• নদীভাঙন, লবণাক্ততা, খরা, বন্যা– এসব সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে তরুণদের পরিবেশ সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

• নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সবুজ প্রযুক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষরোপণ– এসব উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।

৮. সাংস্কৃতিক চেতনা, ভাষা ও জাতীয় পরিচয়ের বিকাশ

একটি জাতির আত্মশক্তি নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিতে।

• বাংলা ভাষা, লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংগীত, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পেন্দ্রিয়– এসবকে ধারণ ও লালন করা বাঙালি পরিচয়ের প্রয়োজনীয় অংশ।

• বিদেশি সংস্কৃতির অনুকরণ নয়; বরং বৈশ্বিক সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের ঐতিহ্যের সম্মিলন ঘটাতে পারলে নতুন প্রজন্ম বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

৯. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বশীল নাগরিকতা

গণতন্ত্র শুধু ভোট দেওয়া নয়– এটি একটি সচেতন, দায়িত্বশীল জীবনধারা।

• শান্তিপূর্ণ মতপ্রকাশ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সামাজিক আলোচনা-পরামর্শে অংশগ্রহণ– এসব মূল্যবোধ তরুণরা ধারণ করলে জাতির গণতান্ত্রিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।

নতুন প্রজন্মই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্থপতি। তাদের চিন্তা, দায়িত্ববোধ, সৃজনশীলতা এবং নৈতিক শক্তিই নির্ধারণ করবে স্বাধীনতার সুফল কতটা গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। বিজয় দিবস ২০২৫ তাই তরুণদের সামনে নতুন আহ্বান রেখে যায়–

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে জ্ঞান, মানবতা, সততা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ দেখতে পাচ্ছি– আধুনিক, উন্নয়নশীল, সম্ভাবনাময়। কিন্তু এখনও সামনে অনেক পথ বাকি। ২০২৫ সালের বিজয় দিবস তাই আমাদের সামনে তিনটি প্রত্যয় স্থাপন করে–

১. স্বাধীনতার চেতনাকে অটুট রাখা।

২. উন্নয়ন ও মানবিকতার সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৩. নতুন প্রজন্মকে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করা।

বিজয় দিবস আমাদের শেখায়– ঐক্যবদ্ধ হলে অসম্ভবকেও জয় করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রতিটি নাগরিককে দায়িত্ব নিতে হবে, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে নতুন প্রজন্ম। তাদের শিক্ষা, দক্ষতা, দেশপ্রেম এবং সৃজনশীলতার ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠবে আগামী দিনের বাংলাদেশ– একটি মানবিক, আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ দেশ। বিজয় দিবস ২০২৫ হোক আমাদের নতুন প্রত্যয়– 'স্বাধীনতার দায়িত্ব পালনে আমরা অটল, আর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের হাতে আরও শক্তভাবে অর্পিত।'

ড. সুলতানা আক্তার: প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, sultana@juniv.edu

১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়োল্লাস: ফিরে দেখা ১৯৭১

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

বাঙালির শত বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির দিন ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ, বহু কাঙ্ক্ষিত মহান বিজয় দিবস। এই দিনে রমনার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। লাখো শহিদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের ফলে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছিল নতুন এক দেশের। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের পর ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম ও সহায়-সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে বাঙালি। জন্ম হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি দেশের এক এক এলাকায় যেমন ভিন্ন-ভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছিল, ঠিক তেমনি দেশবাসীর মাঝে একদিকে ছিল বিজয়ের উচ্ছ্বাস-আনন্দ, প্রিয়জনের ফিরে আসার প্রতীক্ষা, ধ্বংসস্তূপ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর স্বজন হারানোর বেদনায় শোকাচ্ছন্ন। মুক্তিযুদ্ধে প্রিয়জন হারানোর ব্যথা ভুলে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের দিনে মুক্ত জনপদে হাজার-হাজার নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিজয় স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলে সারাদেশ। রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানায় আপামর জনগণ। নানাভাবে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে তারা। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনতার উপস্থিতিতে উড়ানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের বিজয়োল্লাসের সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করছি। প্রথমেই আলোকপাত করব রাজধানী ঢাকার দিকে–

ঢাকা: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। সূর্য ডোবার পূর্বমুহূর্ত। যুদ্ধবিধ্বস্ত ঢাকার চারদিকে থমথমে অবস্থা। চলছে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ। এমন পরিবেশের মধ্যেই সন্ধ্যা ৫টা ২৫ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর হওয়ার পরপরই ঢাকায় উল্লাসে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ। এখানে-সেখানে মিছিল আর মিছিল। কেউ নাচছে, কেউবা জড়িয়ে ধরছেন একে অন্যকে। রাস্তার দুই দিকে মানুষের সারি। জয়োল্লাসে ফেটে পড়ছে ঢাকা। মুক্তির জয়োৎসবে আবেগে আপ্লুত হয়ে কাঁদছেন অনেকে। খোলা ট্রাক, ভ্যান, জিপে করে দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় যৌথবাহিনীর সদস্যরা।

তাদের হাতে-কপালে চুমু খাচ্ছেন উৎফুল্ল জনতা।

খণ্ড খণ্ড বিজয় মিছিলে মানুষের স্লোগানে স্লোগানে মুখর ছিল সেদিন। সন্ধ্যা থেকে সারা রাতব্যাপী ঢাকায় বিজয় উল্লাস চলে। এদিন বাড়িতে বাড়িতে রাতভর আলো জ্বলতেও দেখা যায়।

১৬ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই সড়কে সড়কে তরুণ-যুবা আর উৎসুক মানুষের ভিড় লেগে ছিল। সকাল ১০টায় মেজর জেনারেল নাগরার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী সাভার-মিরপুর সড়ক দিয়ে বিপুল করতালি ও মুহূর্মুহু জয় বাংলা ধ্বনির মধ্য দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করে। জেনারেল নাগরার সঙ্গে ছিল মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপ-দল। এর আগে সকাল ৮.৩০ মিনিটে জেনারেল নাগরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় নায়ক জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজির কাছে একটি চিঠি পাঠান। এতে দ্রুত পাকিস্তানি বাহিনীকে ঢাকায় আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

টাঙ্গাইল: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও, টাঙ্গাইল তার আগে ১১ই ডিসেম্বর হানাদারমুক্ত হয়েছিল, তাই বিজয়ের উল্লাস ছিল মূলত ১১ই ডিসেম্বরের, যখন টাঙ্গাইল মুক্ত হয় এবং পতাকা উত্তোলন করে, কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়ের আনন্দ সারা দেশব্যাপী একইরকম ছিল, যেখানে টাঙ্গাইলবাসীও শহিদদের স্মরণ ও বিজয়ের উৎসবে শামিল হয়েছিল। টাঙ্গাইলে বিজয়ের সেই আনন্দ ছিল স্বজন হারানোর বেদনা ভুলে এক নতুন জন্ম ও মুক্তির আনন্দ, যা টাঙ্গাইল মুক্ত দিবস (১১ই ডিসেম্বর) ও বিজয় দিবস (১৬ই ডিসেম্বর) উভয় দিনেই উদ্‌যাপিত হয়।

চট্টগ্রাম: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামে বিজয় উল্লাস ছিল বাঁধভাঙা আনন্দ, মুক্তি ও গৌরবের এক অভূতপূর্ব উদ্‌যাপন; পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর মুক্তিকামী জনতা, মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী রাস্তায় নেমে আসে, জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়। সাধারণ মানুষ, মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক সবাই রাস্তায় নেমে আসে, তাদের মুখে ছিল আনন্দাশ্রু আর কণ্ঠে ছিল বিজয়ের গান। সেদিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ ও সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভগুলোতে ফুল দিয়ে শহিদদের স্মরণ করে।

এই দিনে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যা ছিল দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের দিন। বিজয়ের আনন্দ থাকলেও, এই দিনে শহিদের আত্মত্যাগ এবং নয় মাসের ভয়াবহতা স্মরণ করে এক মিশ্র অনুভূতি বিরাজ করছিল, যা ছিল এক মহিমান্বিত বিজয় দিবস। চট্টগ্রামের এই বিজয় উল্লাস ছিল সমগ্র বাংলাদেশের বিজয়েরই প্রতিচ্ছবি, যা ছিল বাঙালি জাতির সাহস, একতা এবং অদম্য চেতনার এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

খুলনা: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলেও খুলনায় তখনো যুদ্ধ চলছিল। খুলনায় বিজয় হয়েছিল একদিন পর ১৭ই ডিসেম্বর। ওই দিন পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিয়ে যুদ্ধ শেষের ঘোষণা দেন। তবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগেই ১৭ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে সাতটার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা বিনা বাধায় পৌঁছে যান শহরের কেন্দ্রস্থলে। মুক্তিযোদ্ধারা শহরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ স্বাধীনতাকামী মানুষ বেরিয়ে আসে রাস্তায়। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে আকাশ-বাতাস।

বরিশাল: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। তবে বরিশালের প্রেক্ষাপটে এই বিজয় উল্লাস শুরু হয়েছিল এরও কয়েকদিন আগে থেকে, কারণ বরিশাল শহর হানাদার মুক্ত হয়েছিল ৮ই ডিসেম্বর। মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণের মুখে ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী বরিশাল ছাড়তে শুরু করে। ৮ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই মুক্তিকামী জনতা এবং মুক্তিযোদ্ধারা রাজপথে নেমে আসেন এবং স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন।

তাছাড়া ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে যখন ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে, তখন বরিশালের ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমে আসে। বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা ফাঁকা গুলি ছুড়ে এবং মানুষ একে-অপরকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ ভাগাভাগি করেন। প্রতিটি বাড়ি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা উড়তে দেখা যায়। যারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে বা দেশের অন্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, বিজয় দিবসের পর থেকেই তাদের অনেকে বরিশালে ফিরে আসতে শুরু করেন, যা উৎসবের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

কুমিল্লা: ১৬ই ডিসেম্বর দুপুরের পর কুমিল্লায় বিজয়ের আনন্দে উল্লাসিত ছিল সবাই। সাধারণ মানুষ বিজয় আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে ওই দিনটিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। কুমিল্লা মুক্ত হয়েছিল ৮ই ডিসেম্বর। বাংলার বিভিন্ন এলাকার সাথে কুমিল্লাও শত্রুমুক্ত হয় ১৬ই ডিসেম্বর। ১৯৭১-এর ৮ই ডিসেম্বর বুধবার প্রত্যুষে শহরবাসী কুমিল্লা শহরকেও যেন হালকা, স্বচ্ছ ও পবিত্র বলে দেখতে পায়; কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারে কুমিল্লা শহর শত্রুমুক্ত এবং মুক্তি ও মিত্র বাহিনী কুমিল্লা শহরে পৌঁছেছে। এই আনন্দে জনগণ আনন্দ উল্লাসে একে অন্যের সাথে আলিঙ্গন ও জয় বাংলা ধ্বনি দিতে থাকে।

ময়মনসিংহ: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ পাকহানাদার বাহিনীর কবল মুক্ত হয়। তার আগে ১০ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহ হানাদারমুক্ত হয়। এদিন থেকেই এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের মহামিলন ঘটতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে প্রিয়জন হারানোর ব্যথা ভুলে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের দিনে মুক্ত ময়মনসিংহে হাজার-হাজার নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিজয় মিছিল নিয়ে রাস্তায় নামেন। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানায় মানুষ। নানাভাবে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। স্থানীয় ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনতার উপস্থিতিতে উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা।

সেদিনের বিজয় মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ১৯৭১ সালের ৯ই ডিসেম্বর রাতে দখলদার পাকবাহিনী ময়মনসিংহ ছেড়ে টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকায় পালিয়ে গেছে, এমন খবর ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। অবরুদ্ধতার অবগুণ্ঠন তুলে মুক্ত আকাশে স্বস্থির নিশ্বাস ফেলেন মুক্তিকামী জনতা। আকাশ ছোঁয়া আত্মতৃপ্তি নিয়ে মুক্ত আকাশে পতপত করে উড়তে থাকে রক্তে কেনা স্বাধীন দেশের লাল-সবুজের পতাকা। ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে চূড়ান্ত মুক্তিসনদ স্বাক্ষর হবার দিন সকলের মাঝেই এক নতুন আনন্দের শিহরণ বইতে থাকে। যুদ্ধকালীন সময়ে দীর্ঘকালের প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছেদে থাকা ও স্বজন হারানোর সব কষ্ট ভুলে স্বাধীন দেশ পাবার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে সবাই।

যেখানেই রেডিও আছে সেখানেই সব শ্রেণি-পেশার মানুষের ব্যাপক ভিড় বাড়তে থাকে। ছোটো-বড়ো মিছিল নিয়ে মুক্তিকামী জনতা শহরমুখী হতে থাকেন। একজন আরেকজনকে দেখেই কোলাকুলি করতে থাকেন। স্মরণকালের ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিজয় মিছিল। অগ্নিদীপ্ত উল্লাসে বিজয় আনন্দে মেতে উঠার প্রয়াস দেখায় ময়মনসিংহবাসী। কেউ কেউ আনন্দে কাঁদতে থাকেন। এর আগে ১০ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহ অঞ্চল মুক্ত হওয়ায় ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন ভারত বা বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেওয়া রাজনৈতিক নেতাদেরও অনেকেই এলাকায় ফিরে আসেন। এতে উৎসবের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। অনেকেই পতাকা হাতে নিয়ে তা উড়িয়ে দৌঁড়াতে থাকেন।

ফেনী: চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের ১০ দিন আগেই দীর্ঘ ৮ মাসে বিপর্যস্ত ফেনীর আকাশে উড়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ফেনী হানাদারমুক্ত হয়। তাই বিজয়ের বর্ণিল আবহ এখানে একটু আগেই এসেছিল। তবুও চূড়ান্ত স্বাধীনতার প্রহর গুণছিলেন ফেনীর আপামর জনতাও। ৬ই ডিসেম্বর ফেনী মুক্ত হবার পর ফেনীতে যেন নতুন দিন এলো। মানুষের চোখে মুখে আনন্দ আর বেঁচে থাকার সন্তুষ্টি স্পষ্ট হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করেছিল শিশু হতে বৃদ্ধ পর্যন্ত। রেসকোর্সে পাকবাহিনীর আত্মসমপর্ণের খবর পেয়ে আরও একবার বিজয়ের রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল ফেনীর যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনপদে। সাধারণ মানুষ সেদিন আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠেছিল। আয়োজন করে আনন্দ মিছিল না হলেও উচ্ছ্বাস ছিল সবার মাঝেই, একদিকে দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দ, যা পাওয়া যায় তা দিয়ে মিষ্টিমুখ করানো, অন্যদিকে বধ্যভূমি হতে প্রিয়জনের মরদেহের সন্ধান, মরদেহ পেলে স্বজনের কুলখানি-চেহলামের প্রস্তুতি। এরকমই ছিল ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ফেনীর পরিস্থিতি।

মেহেরপুর: ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলেও তার পরের দিন সকালে মুক্তিযোদ্ধারা মেহেরপুরে ফিরে আসে। একে-একে জনা পনেরো মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত হয়ে আকাশের দিকে ফাঁকা গুলি ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করে। ৬ই ডিসেম্বর মেহেরপুর মুক্ত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে। এই খবর দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র প্রচার করে। ১৭ই ডিসেম্বর ভারত থেকে অগণিত নারী-পুরুষ সীমান্ত অতিক্রম করে স্বাধীন বাংলাদেশের মেহেরপুর দেখতে আসেন। বিজয়ের আনন্দ সেদিন শুধু এদেশের মানুষ হিসেবে আমরা অনুভব করেনি। মেহেরপুর দেখতে আসা ভারতের নারী-পুরুষের চোখে মুখেও দেখেছিলাম আনন্দের ঝিলিক। সেই সময় ভারতীয় রুপিতেও মেহেরপুরে কেনাবেচা হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত মেহেরপুর দেখতে আসা ভারতীয় নারী-পুরুষদের আতিথেয়তা করতে সে সময় অনেকের বাড়ি থেকে তাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।

বরগুনা: ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখে বরগুনা (তৎকালীন মহকুমা) পাকহানাদার মুক্ত হয়। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের ভোর থেকেই বরগুনার সাধারণ নাগরিকগণ আসন্ন বিজয়ের অপেক্ষায় রাস্তায় নেমে আসেন। এদিন প্রথম বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে রাস্তায় নেমে আসা ছাত্র-জনতা বিজয়ের আনন্দে খণ্ড-খণ্ড মিছিল করতে থাকেন। স্বাধীন বাংলা বেতারে গান চলছিল 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ'। সেই গান বিজয়ের অন্যরকম আবহ তৈরি করেছিল।

বরগুনায় একদিকে ছিল বিজয়ের আনন্দ অন্যদিকে ছিল স্বজনহারাদের কান্না। বরগুনার সংখ্যালঘু নারীদের ওপর হয়েছিল পাশবিক অত্যাচার। সেইসব নারীরা ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়ের আনন্দে আনন্দিত হতে পারেননি, ইজ্জত হারিয়ে তারা নীরবে ঘরের কোণে চোখের জলে ভেসেছেন। বিজয়ের দিনে বরগুনার সর্বত্রই আনন্দের পাশাপাশি জনমনে একটা চাপা আতঙ্কও ছিল। তৎকালীন মহকুমা শহরের প্রধান সড়কগুলোতে ছাত্র-জনতার আনন্দ মিছিল প্রদক্ষিণ করেছে।

ভোলা: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ভোলাতেও আনন্দে মেতে উঠে মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। পাকবাহিনীর রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের খবর রেডিওতে প্রচারের ফলে মুহূর্তের মধ্যে উল্লাসে ফেটে পড়ে দ্বীপাঞ্চলের মানুষ। যে যার অবস্থান থেকে সেদিন রাজপথে নেমে আসে বিজয়ের সুখে। রাজপথে স্রোতের মতো মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস বিজয়কে বরণ করে নেয়। আনন্দঘন স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর। মুহূর্তের মধ্যে সকল সরকারি-বেসরকারি ও বড়ো-বড়ো ভবনের পাকিস্তানি পতাকা খুলে পুড়িয়ে ফেলা হয়। উত্তোলন করা হয় লাল-সবুজের স্বাধীন দেশের পতাকা। একইসাথে চলে রং ছিটানোর উৎসব ও মিষ্টি বিতরণ। যদিও ১০ই ডিসেম্বর পাকবাহিনীর পলায়নের মাধ্যমে ভোলা মুক্ত হওয়ার পর থেকেই এখানে আনন্দ চলতে থাকে। ১৬ই ডিসেম্বর যেন তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এদিন বিকেলে শহরের সদর রোডস্থ বরিশাল দালানের সামনে জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা মিলে বিজয় সমাবেশ করে। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আনন্দ, বেদনা, কষ্টের অনুভূতি প্রকাশ করা হয় সেই সমাবেশে। সাধারণ মানুষ ব্যাপক করতালি ও উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অভিবাদন জানান।

কুড়িগ্রাম: ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলের দিকে রেডিওতে পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের ঘোষণা শোনার পর কুড়িগ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়োল্লাসে রাস্তায় নেমে আসে। কেউ-কেউ গুলি ছুঁড়ে আনন্দ প্রকাশ করে। তৎকালীন এসডিও আব্দুল হালিম মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেন। কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজে অস্ত্র সমর্পণ করে মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরে যান। নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ীসহ ধরলা নদীর ওপারে থাকা মানুষরা গরুর গাড়ি আর ঘোড়ার গাড়িতে ফিরতে শুরু করেন। অনেক মানুষের চাপে ধরলা ঘাটে নৌকা সংকট দেখা দেয়। শরণার্থীরাও দেশে ফিরতে শুরু করে। দুর্গাপুরে পাকসেনার পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে কয়েকজন আহত হন। ডিসেম্বরের শেষের দিকে প্রায় সবাই দেশে ফিরে আসেন। যুদ্ধ আর গণহত্যায় বিপন্ন কুড়িগ্রামে আবারও প্রাণের সঞ্চার হয়, স্বাভাবিক হয় জনজীবন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ৬ই নভেম্বর সকাল ৯টার দিকে মিত্রবাহিনীর দুটি ফাইটার বিমান পাকবাহিনীর অবস্থানের উপর গুলিবর্ষণ করে। এতে পাকবাহিনী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে ট্রেনে ও পায়ে হেঁটে কুড়িগ্রাম ত্যাগ করে চলে যায়। সেসময় ৩৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা কুড়িগ্রাম শহরে প্রবেশ করে। তারা কুড়িগ্রাম শহরের ওভারহেড পানির ট্যাংকের

উপর বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। এভাবেই হানাদার মুক্ত হয় কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম হানাদার মুক্ত হবার পর কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ, পিটিআইসহ ৬টি স্থানে পতাকা উত্তোলন করা হয়। পাঞ্জাবি পাঠানরা কুড়িগ্রাম ছেড়ে চলে যাবার পর বিভিন্ন এলাকায় পালিয়ে থাকা মানুষ শহরে ফিরতে শুরু করে। পোঁটলা আর ব্যাগ নিয়ে অনেকেই নিজ বাড়িতে অবস্থান নেয়। তবে খাদ্যাভাবসহ নানা উৎকণ্ঠায় সবাই অসুস্থ হলেও তাদের মুখে ছিল হাসি। শহরে প্রবেশ করে উল্লোসিত মানুষরা মুক্তিযোদ্ধাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়।

পিরোজপুরঃ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলটি অন্যান্য বিকেলের চেয়ে ছিল একেবারেই অন্যরকম। পিরোজপুরের মানুষ সেদিন থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর শোনার আনন্দঘন মুহূর্তটির জন্য। ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল থেকে প্রায় সারারাত প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে শহরের রাস্তায়-রাস্তায় শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় এবং থানা সদরসহ সর্বত্র আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতিটি বাঙালি। পিরোজপুর শহরের সরকারি বিদ্যালয় ভবনে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় নেমে এসে ফাঁকা গুলি আকাশে ছুড়ে এ আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে আরো বেগবান করে তোলে। ১৬ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানি বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজি'র আত্মসমর্পণের খবরে পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় নেমে এলে মুক্তির আনন্দে বিভোর শহরবাসী তাঁদের গায়ে পুষ্পবর্ষণ করে।

ঢাকার পতনের খবর পেয়ে এ জেলার সকল মানুষ পথে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। বেতারে খবর শুনে সর্বস্তরের লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ও সারারাত ধরে শহরের বিভিন্ন দর্জির দোকানে শত-শত পতাকা তৈরি করতে দেখা যায়। পরদিন ভোরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি আনন্দ মিছিল শহরের রাস্তায়-রাস্তায় নেচে-গেয়ে আনন্দ-উল্লাস করে।

রাজশাহীঃ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ বিজয় লাভ করলেও ১৮ই ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত হয় রাজশাহী। মুক্তিবাহিনী, মিত্রবাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের ক্রমাগত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদররা কোণঠাসা হয়ে পড়লেও রাজশাহীতে স্বাধীন দেশের প্রথম পতাকা ওড়ে দুইদিন পর। দীর্ঘ নয় মাস বিভীষিকাময় সময়ের অবসান ঘটে। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় আর আত্মপরিচয়ের ঠিকানা করে নেয়ার অনুভূতিতে পুলকিত হয়ে ওঠে রাজশাহীর মানুষ। মুক্তিকামী জনতার ঢল নামে প্রতিটি সড়কে।

১৬ই ডিসেম্বর পরাজয় বরণের পর যৌথ বাহিনীর এই অগ্রগামী দল পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছ থেকে সাদা পাগড়ি ও আত্মসমর্পণের চিঠি নিয়ে রাজশাহী শহরে বীরদর্পে প্রবেশ করে। তাদের চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় মহানগরীর সোনাদিঘীর মোড়ে সাংবাদিক মঞ্জুরুল হকের বাড়িতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুজ্জোহা হল, জেলখানা ও বিভিন্ন বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে নির্যাতিত মানুষেরা। স্বজন হারানোর কষ্ট আর স্বাধীনতার উল্লাসে গোলাপ পানি, ফুলের পাপড়ি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা-মিত্রবাহিনীকে বরণ করে নেয় রাজশাহীর মানুষ। মিত্রবাহিনীর বিমানকে স্বাগত জানাতে সবাই তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ১৮ই ডিসেম্বর রাজশাহী মুক্ত হলে শহরের ঐতিহাসিক মাদ্রাসা মাঠে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলেন লাল গোলা সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। পরে পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজশাহী ছেড়ে চলে যায় নাটোরে। তাদের দোসররা বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপন করে।

সিলেটঃ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সিলেট শহর ছিল এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও বিজয়ের উল্লাসে মাতোয়ারা। যদিও ঢাকা শহরে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে, কিন্তু সিলেটে এর প্রস্তুতি ও উত্তেজনা শুরু হয়েছিল তার আগে থেকেই। সিলেট শহর পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৫ই ডিসেম্বর থেকেই। ওই দিন বিকেল ৩টার দিকে সিলেটের পাকিস্তানি বাহিনীর তিনজন ব্রিগেডিয়ার এবং ৬০০০-এর বেশি সৈন্য যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এটি ছিল ঢাকার মূল আত্মসমর্পণের প্রায় ২৬ ঘণ্টা আগের ঘটনা। ফলে ১৬ই ডিসেম্বর যখন সারাদেশ বিজয়ের খবর পায়, সিলেটে তখন উৎসবের আবহ আরও আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে যখন রেডিওতে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের খবর প্রচার করা হয়, তখন সিলেটের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। জিন্দাবাজার, কোর্ট পয়েন্ট এবং বন্দরবাজার এলাকা বিজয় উদ্‌যাপন করে। মানুষ একে-অপরকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন দেয়। সিলেট মুক্ত হওয়ার পর বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা ও সাব-সেক্টর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা শহরে প্রবেশ করতে শুরু করেন। সাধারণ মানুষ ফুল দিয়ে এবং স্লোগান দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বরণ করে নেয়। অনেক জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, যা ছিল দীর্ঘ নয় মাসের প্রতীক্ষার অবসান।

শেরপুরঃ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যখন ঢাকা স্বাধীন হয়, তখন শেরপুর ইতোমধ্যেই বিজয়োল্লাসে মেতে ছিল। শেরপুর জেলা প্রকৃতপক্ষে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তান হানাদার মুক্ত হয়। ১৬ই ডিসেম্বরের অনেক আগেই, অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা শেরপুরকে একটি মুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ১৬ই ডিসেম্বর যখন পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে, তখন শেরপুরের মুক্তিকামী মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় নেমে বিজয় মিছিল বের করেন। শত শত মুক্তিযোদ্ধার আনন্দ নৃত্য এবং সাধারণ মানুষের বিজয়োল্লাসে ছড়িয়ে পড়ে পুরো শহরে।

ড. আবদুল আলীম তালুকদারঃ কবি, শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক, dr.alim1978@gmail.com

একাত্তরের রণাঙ্গনে নারীদের কথা

কামরুন-নাহার-মুকুল

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরব; অহংকার। ইতিহাসে এক মহান অর্জন, সুখ ও শোকে মেশানো গৌরবময় এক বিজয়ের কথা। যে বিজয় বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছে একটি রক্তাক্ত মানচিত্র। যার ইতিহাস ত্যাগ আর সংগ্রামের এক সুবিশাল মহাকাব্য। সে মহাকাব্যের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে সংগ্রাম, ত্যাগ ও নির্যাতনের কথা।

মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করে হয়নি। অনেক বছরের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জন্য আবশ্যিক হয়ে ওঠে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন পূর্ব বাংলার বেশির ভাগ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরই মানুষের মোহ ভঙ্গ হয়। আমাদের মায়ের ভাষা– বাংলা ভাষা, যে ভাষায় আমরা কথা বলি; সে ভাষাও কেড়ে নিতে চেয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নারীমুক্তির দাবিগুলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের আওতায় পূরণ হওয়া সম্ভব নয়, এই সত্যিটা শিক্ষিত সচেতন মানুষদের বুঝতে দেরি হয়নি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধপূর্ব প্রেক্ষাপট ও ঘটনাপ্রবাহের সংগ্রাম হয়েছে কয়েকটি ধাপে। যার প্রতিটি ধাপে রয়েছে এদেশের নারীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও আত্মত্যাগ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম দুটি নক্ষত্র প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি– বাংলাদেশের নারীদের রয়েছে সাহসী সংগ্রাম, যুদ্ধ ও আত্মদানের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস। বীরকন্যা প্রীতিলতার পথ ধরে চট্টগ্রামের নারীসমাজ মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবান্বিত ভূমিকা পালন করেন। মিছিলের একমাত্র স্লোগান ছিল:

> মা বোনেরা প্রীতিলতার পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।
> মা বোনেরা ঘর ছাড়ো, প্রীতিলতার পথ ধরো।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই ছিল জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধে নারীকে যেমন অসহায় করেছে, তেমনি সাহসীও করেছে; নারী যোদ্ধা হয়েছে। যে কেবল তরুণী হয়ে উঠেছিল, সেও সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশ রক্ষার জন্য। যে চিরদিন গৃহকোণে উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছে সে বউটিও মুক্তির জন্য জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ করে গেছে। কোনো তকমা বা খেতাবের জন্য লড়াই করেননি। লড়াই করেছেন পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারী সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, সম্মুখ সমরে অংশ নিয়েছেন এবং গেরিলা বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

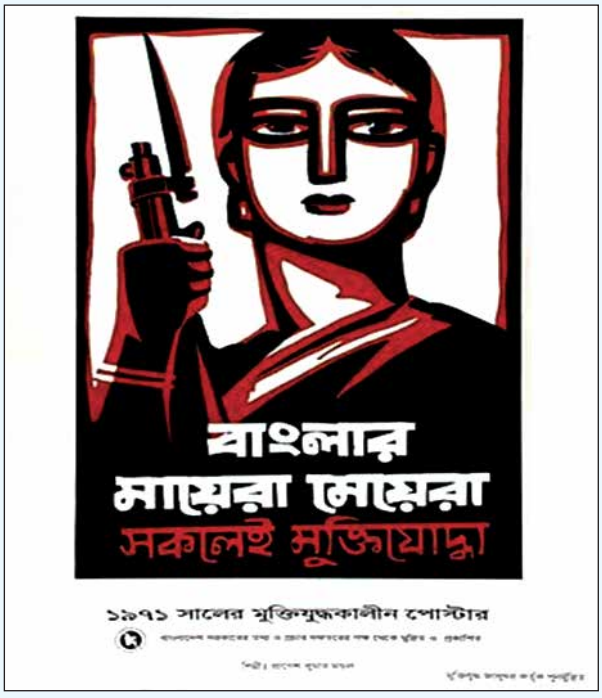

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন পোস্টার

রেখেছেন। নারীর বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা ও সাহসের ফসল আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। সে যুদ্ধের সৈনিক ছিলেন পঞ্চাশ শতাংশই নারী। নারীদের ভূমিকা ছিল বহুমুখী। সারা বাংলাই ছিল তাদের জন্য রণাঙ্গন। নানা কারণে পুরুষের মতো নারী সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিতে না পারলেও প্রাণ বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ জয়ের নেপথ্যে নীরবে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। ঘর থেকে ভাই, স্বামী, ছেলেদের যুদ্ধে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছেন। নানামুখী ভূমিকায় নারীরা ছিলেন অদম্য। কেউ ক্যাম্পে রান্নার কাজ করেছেন, অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রহরী হয়ে থেকেছেন, কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র এগিয়ে দিয়েছেন। বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বার্তাবাহকের ভূমিকায়ও নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অভূতপূর্ব। গোপনে অস্ত্র সংরক্ষণ ও যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া এবং বিভিন্ন যুদ্ধস্থলের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদানের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নারীরা সীমাহীন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। কখনো সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন আবার কখনো যুদ্ধক্ষেত্রের আড়ালে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের অবস্থান সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। কেউ বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রেখেছেন এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা ও চিকিৎসা করেছেন। যে যেভাবে পেরেছেন, সেভাবে কাজ করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। ওষুধ-পথ্য, খাবার এবং কাপড় সংগ্রহ করে দেওয়ার সক্রিয় কর্মকাণ্ডই ছিল নারীদের মুক্তিযুদ্ধ। এরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের নীতিতে নারীদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া, গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা এবং প্রশাসনিক কাজের নেতৃত্বদানের দায়িত্ব দেওয়ায় কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না; তারপরেও নারীরা মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন অগ্রগামী। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, শান্তি কমিটি, রাজাকার বাহিনীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে অসংখ্য নারী নীরবে-নিভৃতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন।

কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রতিনিধি পরিচালনায় গোবরা ক্যাম্পে নারীদেরকে সিভিল ডিফেন্স, নার্সিং এবং অস্ত্রচালনা ও গেরিলা আক্রমণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। সেখানে ৩০০ তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। গোবরা ক্যাম্পে অস্ত্রচালনা শেখার পরও তাঁদেরকে সম্মুখ সমরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তারপরও অস্ত্র হাতে রণাঙ্গনে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন অনেক নারী। তারামন বিবি, ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, কাঁকন বিবি, শিরিন বানু মিতিল, ফোরকান বেগম, আশালতা, রওশন আরা, আলেয়া বেগমসহ আরো অনেক নারী সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বীর প্রতীক খেতাব পেয়েছেন তিন জন। ১৯৭২ সালে ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, ১৯৭৩ সালে তারামন বিবি ও ১৯৯৭ সালে কাঁকন বিবি। তারামন বিবি ও কাঁকন বিবি ২০১৮ সালে প্রয়াত হয়েছেন এবং দীর্ঘদিন দুজনই ছিলেন বিস্মৃতির আড়ালে।

যুদ্ধের সময় আহত নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করার জন্য নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন। ক্যাম্পে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে হাসপাতাল ও ফিল্ড হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। এসব চিকিৎসাকেন্দ্রে নারীরাই সবচেয়ে বেশি সেবা কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগমকে সুশীল সমাজের কাছে একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছিল তিন দশক। তিনি পেশায় একজন বাংলাদেশি ডাক্তার এবং একজন সেনা কর্মকর্তা। তিনি সেক্টর ২-এর অধীনে কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। তাকে নিয়মিত আগরতলা থেকে ওষুধ আনার কাজ করতে হতো। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মেঘালয়ে বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল নামে ৪৮০ শয্যার একটি হাসপাতাল ছিল। সেখানে একটি অপারেশন থিয়েটারও ছিল। এই হাসপাতাল হয়ে ওঠে রণক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এক আশ্রয়ের ঠিকানা। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বাঙালি ছাড়াও সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকজন চিকিৎসা সেবা নিত। প্রথম দিকে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা দেওয়া কঠিন হলেও জুলাই মাসের শেষে ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম সিও হিসেবে দায়িত্ব নেন। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি তার মেধা, দক্ষতা, আন্তরিক পরিশ্রম আত্মনিবেদিত সেবা ও পরিকল্পনায় হাসপাতালটিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। তার কাজ ছিল অসাধ্য সাধন করে যাওয়া; সেবাকেন্দ্রটি হয়ে ওঠে সামরিক হাসপাতালের পর্যায়ের। যুদ্ধের সময় আঁচলে হ্যান্ড গ্রেনেড বেঁধে ঘুরতেন ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম।

১৯৭১ সালে বাংলার মানুষ যখন প্রাণ বাজি রেখে দেশ স্বাধীন করার জন্য লড়ছেন তখন হাবিলদার মুহিবও তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছেন। তারই আবিষ্কার তারামন। তারামন তাকে ধর্মবাপ বলতেন। তিনিই তারামনের হাতে রাইফেল ও স্টেনগান তুলে দেন। শুধু হাতে তুলেই দেননি; চালানোও শিখিয়েছিলেন।

তারামনের বয়স তখন ১৩ কী ১৪ বছর। দশঘেরা ক্যাম্পে একমাত্র মেয়ে ছিলেন তিনি। দশঘেরা ক্যাম্প থেকে বদলি হয়ে তিনি চলে যান বাজিতপুর। এরপর এগারো নম্বর সেক্টরে অনেক যোদ্ধা ও সৈনিকের সাথে পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন তিনি। সেখানে তার ধর্মবাবাও ছিলেন। তখন তারামনের যোগ্যতা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি। মুক্তিযোদ্ধার ক্যম্পে, রান্নার দায়িত্ব

পালন করার সাথে সাথে অস্ত্র চালনা শিখে অনেক সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে খান সেনাদের হত্যা করেন। তারামন এবং তার সঙ্গীরা শুধু স্থল ও নদীপথের আক্রমণ প্রতিরোধ করেনি; প্রতিরোধ করেছিল পাকিস্তানি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিমানবাহিনীর হামলাও। স্বাধীনতার পর তিনি আড়াল হয়ে গেলেন। ১৯৭৩ সালের গেজেট নোটিফিকেশনে 'বীর প্রতীক' খেতাব পেলেন তারামন। ১৯৯২ সালে পদকটি বিতরণ করা হয়েছে; তখনও তারামনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ১৯৯৫ সালে তার সন্ধান পাওয়া যায় এবং ১৯৯৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে পদকটি প্রদান করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তারামন আব্দুল মজিদ নামে একজন কৃষকের স্ত্রী। ১ ছেলে ও ১ কন্যা সন্তানের জননী।

কাঁকন বিবি খাসিয়া সম্প্রদায়ের কন্যা। তার আসল নাম 'কাঁকাতো হেনিনচিতা'। তার মূল বাড়ি ছিল ভারতের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশের এক গ্রামে। বিয়ের পর নাম পরিবর্তিত করে নতুন নাম রাখা হয় নুরজাহান বেগম। অল্প বয়সে ধর্মান্তরিত হয়ে বাংলা বাজারের মাহীদ আলীকে বিয়ে করেন। অল্পদিনেই স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেন। এরপর সীমান্ত রক্ষী আব্দুল মফিজ খাঁর সাথে তার বিয়ে হয়; তখনই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ তিনি এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন; যার নাম সখিনা। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় স্বামীর সঙ্গে তার মনোমালিন্য দেখা দেয়। এরপর মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কারণে স্বামী তাকে তালাক দেন। নিঃস্ব অসহায় কাঁকন বিবি পাক সেনা ও তাদের দোসরদের মুভমেন্টের সকল খবরাখবর মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিতেন। ধরা পড়েন পাঞ্জাবীদের হাতে। পাঞ্জাবীরা শিক গরম করে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নির্মমভাবে ছেঁকা দিত। অসহ্য নির্যাতন সহ্য করেও মুখ খুলেননি। কৌশলে সেনা ক্যাম্প থেকে তিনি পালিয়ে বাঁচেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে কাঁকন বিবি জড়িয়ে পড়েন সম্মুখযুদ্ধে। জাউয়া সেতু ধ্বংসের সময় কাঁকন বিবি এক রাতের অন্ধকারে কলাগাছের ভেলায় সকল অস্ত্র-গোলাবারুদ বয়ে নিয়ে পৌঁছে দেন সহযোদ্ধাদের কাছে। প্রায় ২০টি যুদ্ধে তিনি সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। জীবিকার প্রয়োজনে তাকে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নিতে হয়। 'খাসিয়া মুক্তি বেটি' হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।

কাঁকন বিবির মতো আরও অনেক নারী এ দেশের জন্য লড়েছেন। পুরুষের পোশাক পরে যুদ্ধ করেছেন আলেয়া বেগম। তিনি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা কমান্ডের ইউনিট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। রাইফেল, বন্দুক, এস এম জি, এস এল আর সবকিছু চালানোতেই তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। শত্রুপক্ষের শক্তি ও অবস্থান বুঝে তাদের মোকাবিলা করার জন্য এসব সমরাস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি ছুটতেন। একাধিক সম্মুখ সমরে তার ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি। তিনি ভারতের চাপড়া ট্রেনিং ক্যাম্পে যুদ্ধ কৌশল ও সমরাস্ত্র চালানো শেখেন।

২৭শে মার্চ পুলিশ লাইনে যুদ্ধ শুরু হলে শিরিন বানু মিতিল পুরুষের পোশাক শার্ট-প্যান্ট পরে তার দুই খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়েন। ২৮শে মার্চ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সংঘটিত যুদ্ধে ৩৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং শিরিন বানু মিতিলের দলের ২ জন শহিদ হন। এভাবে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০শে মার্চ পাবনা শহর স্বাধীন হয়। পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কন্ট্রোল রুমের আওতায় শিরিন বানু বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নারী হিসেবে তিনি দেশের গৌরব।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হলেও কয়েকজন সাহসী ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কয়েকটি ব্যক্তিগত বাহিনীও শক্তিশালী ছিল। ৮নং ও ৯নং সেক্টরের অধীন মো. হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে 'হেমায়েত বাহিনী' গড়ে ওঠে। সে বাহিনীতে মো. হেমায়েত উদ্দিনের স্ত্রী সোনেকা রাণী রায় এবং দুই বোন আমেনা বেগম ও মোমেনা বেগম অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। এই বাহিনীতে 'হাজেরা সুলতানা' নামেও এক নারী যোদ্ধা ছিলেন। ১১নং সেক্টরে বন্দুক হাতে অনেক নারী যোদ্ধা সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তারা স্বীকৃতি পাননি।

বাগেরহাটের মেহেরুন্নেসা মিরা ছিলেন যাত্রা শিল্পী, যুদ্ধ শুরু হলে তাঁর শিল্পী মন যুদ্ধের বিভীষিকায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ১১নং সেক্টরের আওতায় যুদ্ধে অংশ নেন। বরিশালের শোভা রানী মন্ডল স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সিরাজ সিকদারের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে আঘাত হেনেছেন শত্রুর ঘাটিতে। তিনি সুইসাইড স্কোয়ার্ডের অন্যতম নারী সদস্যও ছিলেন।

মুক্তিসংগ্রামে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আর এক সাহসী সংগ্রামী নারী মুক্তিযোদ্ধা বরিশালের করুণা বেগম। পুরুষ মুক্তিযোদ্ধারা কোনোও নারীকে সহযোদ্ধা হিসেবে নিতে রাজি হবেন না জেনে করুণা বেগম শার্ট-প্যান্ট এবং টুপি মাথায় দিয়ে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি ছিলেন গেরিলা যোদ্ধা। তিনি কখনও ভিখারির বেশে, কখনও গ্রাম্য কুলবধূর বেশে শত্রুশিবিরে নির্ধারিত অপারেশন চালিয়েছেন। স্বামী শহীদুল হাসান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন। জয়ন্তী নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে অনেকের সাথে শহীদুলকে গুলি করে হত্যা করা হয়। স্বামীর শহিদ হওয়ার একমাস পর ৩ বছরের শিশু সন্তান রেখে করুণা বেগম মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন।

কাসিমাবাদ ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে পাক সেনাদের বাংকারে সফলভাবে গ্রেনেড চার্জ করে ফিরে আসার সময় তার ডান পায়ে একটি গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি নিজেই মারাত্মকভাবে আহত হন। এ লড়াই চলে চার ঘণ্টা ধরে। এ যুদ্ধে ১০ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। কয়েকবার শল্য চিকিৎসা হয়েছে। কিন্তু তার পা আর ভালো হয়নি। ক্র্যাচে ভর করে করুণা বেগম চলাফেরা করতেন।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার মধ্যে রয়েছেন অনন্যা পুরস্কারপ্রাপ্ত সন্ধ্যারানী সাংমা। ১৯৫০ সালে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বোকারবাইট গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন নার্সিং দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রী। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ময়মনসিংহ থেকে হালুয়াঘাটের দিকে অগ্রসর হলে তিনি তাঁর দূর সম্পর্কীয় বোন ভেরোনিকা সিমসাংয়ের সঙ্গে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের মহেন্দ্রগঞ্জ থানার অধীনে চাপাহাতি গ্রামে চলে যান। হালুয়াঘাটের জয়রামকুড়া নার্সিং হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা ডাক্তার প্রেমাংকুর রায় তাদের দুজনকে ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে ফিল্ড নার্সিং হাসপাতালে নিয়ে যান। এই হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন ডাক্তার প্রেমাংকুর রায় নিজে এবং ১১ নম্বর সেক্টরের ক্যাপ্টেন আব্দুল মান্নান। হাসপাতালটির অবস্থান বাঘমারা ক্যাম্প থেকে ৪০০ গজ দূরে। হাসপাতালটিতে মেডিসিন ওয়ার্ড ও সার্জারি ওয়ার্ডে প্রতিদিন আহত ও রোগাক্রান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দেওয়া হতো। সেখানে যুক্ত হন সন্ধ্যারানী সাংমাত ও ভেরোনিকা সিমসাং এবং মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন।

মুক্তিযুদ্ধে নারী গেরিলা বেগম ফোরকানের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল প্রথম গেরিলা স্কোয়াড। তার নেতৃত্বে প্রথম দলে ছিলেন আটজন। তারা ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। নারীদের গেরিলা ট্রেনিংয়ের জন্য বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে শতাধিক নারীকে নির্বাচিত করে তাদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে ধারণা দেওয়াসহ সুইসাইড স্কোয়াডের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

নাজিয়া ওসমান চৌধুরী কুষ্টিয়া রণাঙ্গনে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। সেলিনা বানু সশরীরে উপস্থিত হয়ে যোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখা এবং শরণার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগাতে তৎপর ছিলেন।

নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তবুও তারা পাকিস্তানিদের সঙ্গে আপোশ করেননি। বন্দি শিবিরে আটকে রেখে ভয়াবহ নির্যাতন করে অসংখ্য নারীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ক্যাম্পে আটক রাখা পুরুষ মুক্তিযোদ্ধার মতো নারী মুক্তিযোদ্ধাকেও একইভাবে শারীরিক মানসিক চরম নির্যাতন করছে। পরবর্তীতে পুরুষযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেও নারীকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বরং নারীকে 'অচ্ছুত', 'সম্ভ্রম হারানো' বলে কোণঠাসা করা হয়েছে। অনেক নিপীড়িত নারী দেশ ছেড়ে চলে যেতেও বাধ্য হয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল এ দেশের মানুষের জীবন-মরণের যুদ্ধ, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ, অস্তিত্বের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছিল অস্তিত্বের প্রয়োজনে। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন নারীরা। যুদ্ধ মানেই নারী নির্যাতন, যুদ্ধ মানেই ধর্ষণ। ড. নীলিমা ইব্রাহীমের 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' বইতে উল্লিখিত বিভিন্ন কেস স্টাডিতে দেখা যায়, নারীদের বীরাঙ্গনা উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল আবার পঁচাত্তরের পর তাদেরকে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। যে বীরাঙ্গনা উপাধি ছিল গৌরবের সেটা পরবর্তীতে হয়ে দাঁড়ায় অপমানের। প্রখ্যাত সাহিত্যিক রিজিয়া রহমান তাঁর রক্তের অক্ষরে উপন্যাসে নারীর জন্য প্রতিকূল সামাজিক অবস্থার ছবি এঁকেছেন পরম মমতায়।

ঢাকা কুমিল্লার বড়ো রাস্তার পাশে কালের সাক্ষী হয়ে সেনারা এখনও শায়িত আছেন। কিন্তু নিবেদিতপ্রাণ নারী কর্মীদের নাম সেখানে উল্লেখ নেই। অথচ মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলত নারী-পুরুষের সম্মিলিত ধারায় যুক্ত। নারী-পুরুষ মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছে। এ সকল নারী আমাদের জাতির গৌরব। তারা যুদ্ধের বীর নারী। তাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ইতিহাস আমাদের বিজয়ের ইতিহাস, গৌরবের ইতিহাস। তাদের আত্মত্যাগের মূল্যকে খাটো করে দেখা চলে না। তাদের এই আত্মত্যাগের মহিমা বাংলাদেশের বিজয়ের একাংশ জুড়ে আছে। নারী সমরে ছিল, ছিল নেপথ্যের শক্তি-সাহসে। মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ঈর্ষণীয়, যা যুদ্ধজয়ের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধের পরের প্রজন্ম জানে না মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতাকে। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, গেরিলা নেত্রী ও সহযোদ্ধা।

কামরুন-নাহার-মুকুল: ফিচার রাইটার, প্রাবন্ধিক ও সাবেক কর্মকর্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হালদা নদীকে মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হালদা নদীকে মৎস্য হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করে গত ৫ই নভেম্বর প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে রুই জাতীয় মাছের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিতকরণ ও গাঙ্গেয় ডলফিনের আবাসস্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় ও মানিকছড়ি উপজেলা, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি, রাউজান, হাটহাজারী উপজেলা এবং পাঁচলাইশ থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হালদা নদী এবং নদী তীরবর্তী ৯৩ হাজার ৬১২টি দাগের ২৩ হাজার ৪২২ দশমিক ২৮০৫৯ একর জায়গা 'হালদা নদী মৎস্য হেরিটেজ' হিসেবে ঘোষণা করা হলো। এপ্রিল-জুন মাসে হালদা নদীর বিভিন্ন স্থানে রুই জাতীয় মাছের প্রজননের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিষিক্ত ডিম পাওয়া যায়।

এছাড়া, উন্নততর পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে এলাকার সীমা-পরিসীমা নির্ধারণসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মাঝে মাঝে বিধি-নিষেধ আরোপসহ প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারবে। প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়েছে, জারিকৃত গত ১৩/১২/২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রতিবেদন: কাকলি ইয়াসমিন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে ৯ই ডিসেম্বর ২০২৫ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্তরা ফটোসেশনে অংশ নেন— পিআইডি

নারীমুক্তির পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া

রহিমা আক্তার মৌ

'মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরান শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহু দূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়।'– বেগম রোকেয়া। এবছর বেগম রোকেয়ার ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী ও ৯৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়।

ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের শৃঙ্খলা থেকে নারীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেছেন যে কয়েকজন নারী, তাদের মাঝে প্রথম সারির একজন হলেন নারী জাগরণের পথিকৃৎ মহীয়সী বেগম রোকেয়া। উনিশ শতকের শেষদিকে সময়টা ছিল যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমান নারীদের জন্য অন্ধকার যুগ। যে যুগে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে বাঙালি মুসলমানরা মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করত, সেই অন্ধকার যুগে বেগম রোকেয়া পর্দার অন্তরালে থেকেই নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন এবং মুসলমান মেয়েদের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পথ সুগম করেন। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়েদের কঠোর পর্দা মেনে চলতে হতো। বিনা প্রয়োজনে মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। তাদের লেখাপড়া করার তেমন সুযোগ ছিল না, কেবল ঘরের কাজকর্ম শেখানো হতো। তারা নিজ গৃহে বা স্থানীয় মক্তবে আরবি, ফারসি শিখত। হিন্দু নারীরাও ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

বহুমাত্রিকতায় অনন্য বেগম রোকেয়া একাধারে দার্শনিক, লেখক, সমাজ সংস্কারক, নারীশিক্ষার পথিকৃৎ, নারীমুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে আবির্ভূত বহুমুখী রোকেয়া সারাজীবন নারীমুক্তি ও অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করেছেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক বেগম রোকেয়া আজীবন কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন কিন্তু প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার নামে ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধের আদর্শ ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেননি।

বাঙালি মুসলিম সমাজে রোকেয়াই সর্বপ্রথম শিক্ষা বিস্তারকে নারীমুক্তি ও প্রগতির বৃহত্তর অভিযাত্রার সাথে যুক্ত করেন। তাঁর সমাজ ভাবনা মূলত নারীমুক্তি ভাবনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীর প্রতি যে নিষ্ঠুরতা ও অবিচার তারই বিরুদ্ধে ছিল রোকেয়ার আপোশহীন সংগ্রাম। আর এ সামাজিক উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে তিনি শিক্ষাকেই প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'শিক্ষা বিস্তারই এই সব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ।' শিক্ষা বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন, যা নারীদের মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বোধ জাগাবে।

১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বেগম রোকেয়া। আর দশজন মুসলমান মেয়ের মতো বেগম রোকেয়াও মুসলিম পারিবারিক নিয়মে বেড়ে উঠছিলেন। পিতা জহীরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের এবং মাতা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী। ছয় ভাইবোনের মাঝে রোকেয়ার দুই বোন করিমুননেসা ও হুমায়রা, আর তিন ভাই যাদের একজন শৈশবে মারা যায়।

রোকেয়ার পূর্ব পুরুষগণ মুঘল আমলে উচ্চ সামরিক এবং বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োজিত ছিলেন। তৎকালীন মুসলিম

সমাজব্যবস্থা অনুসারে রোকেয়া ও তার বোনদের বাইরে পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়নি, তাদেরকে ঘরে আরবি ও উর্দু শেখানো হয়। বেগম রোকেয়ার পরিবারে পর্দা প্রথার এতই কড়াকড়ি ছিল যে, আত্মীয় পুরুষ তো দূরের কথা বহিরাগত নারীদের সামনেও সাবের পরিবারের মেয়েদের পর্দা করতে হতো।

একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে পারেননি রোকেয়া। বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য বেগম রোকেয়ার আগ্রহ ছিল প্রবল। পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বসবাস করার সময় একজন মেম শিক্ষয়িত্রীর নিকট তিনি কিছুদিন লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবের ও বড়ো বোন করিমুননেসার হাতে শৈশবকালে বেগম রোকেয়ার লেখাপড়ার হাতেখড়ি। বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবের আধুনিক মনস্ক ছিলেন। বেগম রোকেয়াকে লেখাপড়ায় উৎসাহ, প্রেরণা ও সহযোগিতা করেন। লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহ দেখে বড়ো বোন করিমুননেসা এবং বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাহেবের সহযোগিতায় তিনি বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন।

১৮৯৮ সালে ১৮ বছর বয়সে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় বিহার রাজ্যের ভাগলপুরের অধিবাসী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। রোকেয়ার প্রকৃত নাম 'রোকেয়া খাতুন' এবং বৈবাহিকসূত্রে নাম 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন'। সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ছিলেন সমাজ সচেতন, প্রগতিশীল ও সংস্কারমুক্ত মানুষ। তার সাহচর্যে এসেই রোকেয়ার লেখাপড়ার উন্মেষ ঘটে। স্বামীর কাছ থেকে তিনি ইংরেজি ও উর্দু শিক্ষা লাভ করেন। সমাজ মনস্ক রোকেয়ার স্বামী সবসময় নারীশিক্ষার কথা বলতেন। নারীদের শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি স্ত্রীকে ১০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন এবং স্ত্রী রোকেয়াকে তার সম্পত্তির ট্রাস্টি করে যান। ১৯০২ সালে পিপাসা নামে একটি বাংলা গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন।

বেগম রোকেয়ার দাম্পত্য জীবন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি, ৩রা মে ১৯০৯ সাখাওয়াত হোসেন ইন্তেকাল করেন। স্বামীর মৃত্যু তাঁর জীবনে সাময়িক বিপর্যয় ঘটালেও অকাল বৈধব্য তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ইতঃপূর্বে তাঁদের দুটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে অকালেই মারা যায়। অসীম মনোবল সম্পন্ন এই নারী শোককে শক্তিতে পরিণত করে নারীশিক্ষার বিস্তার ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর স্বামীর ভাগলপুরে একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল। ১৯০৯ সালের ১লা অক্টোবর মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরের তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের সরকারি বাসভবন 'গোলকুঠি'তে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'-এর যাত্রা শুরু। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধসহ আরও নানা প্রতিকূলতার কারণে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর স্কুলটি কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে ১৩ নম্বর ওয়ালীউল্লাহ লেনের ভাড়া বাড়িতে নতুন করে চালু করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'।

নারী সমাজের মুক্তির জন্য এ ধরনের শিক্ষা ভাবনা থেকেই তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সমাজ ভাবনার কেন্দ্রে ছিল নারীর অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠা করা। নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি প্রধান উপায় ভেবেছেন অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাবলম্বনকে। সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে এ ধরনের চিন্তা সমসাময়িককালে সাহসিকতার পরিচয় তুলে ধরে। সমাজ প্রগতি ভাবনার ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া ছিলেন মুক্তিবাদ ও মুক্ত দৃষ্টির অধিকারী। প্রথমদিকে কেবল অবাঙালি ছাত্রীরাই পড়ত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। রোকেয়ার অনুপ্রেরণায় ক্রমশ বাঙালি মেয়েরাও এগিয়ে আসে পড়াশোনার জন্য। ছাত্রীদের পর্দার ভেতর দিয়েই ঘোড়ার গাড়িতে করে স্কুলে আনা-নেওয়া করা হতো। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে তাফসিরসহ কোরান পাঠ থেকে আরম্ভ করে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, হোম নার্সিং, ফার্স্ট এইড, রান্না, সেলাই, শরীরচর্চা, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো।

নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করার কাজে লেগে গেলেন। মেয়েদের মা, বাবা ও অভিভাবকদের অনুরোধ জানালেন। মেয়েরা কঠোর পর্দা মেনে চলত বলে তিনি পর্দাঘেরা গাড়ির ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকল। পরে ১৯১৭ সালে মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুল এবং ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নীত হয়। সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে তাঁর লেখায়। মুক্তচিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং শানিত লেখনীর মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়া বিশ শতকের একজন বিরল ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সে যুগের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরোজিনী নাইডু, তদানীন্তন বড়লাট পত্নী লেডি চেমসফোর্ড, লেডি কারমাইকেল, ভূপালের বেগম সুলতান জাহান প্রমুখ মহিলা বেগম রোকেয়ার সাহিত্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁর কাজের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সম্পর্কে বঙ্গের মহিলা কবি গ্রন্থে লিখেছেন–

'রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। গভীর রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে চুপিচুপি বিছানা ছাড়িয়া বালিকা মোমবাতির আলোকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে ইংরেজি ও বাংলায় পাঠ গ্রহণ করিতেন। পদে পদে গঞ্জনা সহিয়াও এভাবে দিনের পর দিন তাঁহার শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। কতখানি আগ্রহ ও একাগ্রতা থাকিলে মানুষ শিক্ষার জন্য এরূপ কঠোর সাধনা করিতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়।'

১৯১৯ সালে বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় 'মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল'। সেখানে নারীদের সেলাই, রান্না, সন্তান প্রতিপালনসহ বিভিন্ন বিষয়ে শেখানো হতো। বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। স্কুল পরিচালনা ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রোকেয়া নিজেকে সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখেন। ১৯১৬ সালে তিনি মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন।

'মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিচিত হইতে পারে।'– বেগম রোকেয়া

"এইখানে গোঁড়া পর্দাপ্রিয় ভগ্নীদের অবগতির জন্য দু-একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে পর্দাবিদ্বেষ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য দেখিতে না পান, তবে আমাকে মনে করিতে হইবে আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই।"

নারীরশিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার নেতৃত্বে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম সে যুগে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে যেসব নারী নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের অনেকেই বেগম রোকেয়ার স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

পুরুষ-নারীর শাসক বা প্রভু নয় বরং সহযোগী এমন মতের বিশ্বাসী ভেবেই তিনি সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল দেখেছেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে সাধারণ জীবনযাপন করা মানুষের নারীদের সংগ্রাম সচেতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষের পরাধীন অবস্থার অবমাননার চিত্র এবং জন্মভূমির দীনতা দূর করার নিদর্শনগুলো তুলে ধরেছেন *মুক্তিফল* নামক গ্রন্থে। 'পৌরাণিক মনে স্ত্রী বিদ্বেষ' নামক প্রবন্ধে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার অনেক অংশজুড়ে ছিল সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার তথা নারীমুক্তির বিষয়গুলো। 'স্ত্রী জাতির অবনতি', 'অর্ধাঙ্গী', 'নিরীহ বাঙালি', 'বোরকা'– এইসব প্রবন্ধে তাঁর সুপরিশীলিত ও সুচিন্তিত মতের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।

বিবিসি বাংলাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কেতকী কুশারী ডাইসন বলেন, 'বাংলার নবজাগরণের মতো বড়ো একটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া, কিন্তু নারীমুক্তির বাস্তব পথ দেখাতে তার অবদান ছিল বিশাল। মেয়েদের শিক্ষার জন্য তার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা, যেটা ছিল নারীশিক্ষার পথে একটা মস্ত বড়ো অবদান।' (তথ্যসূত্র: ১২ই মার্চ ২০২০, *দৈনিক যুগান্তর*)

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মরণে বাংলাদেশ সরকার একটি গণ-উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে পৈতৃক ভিটায় ৩ দশমিক ১৫ একর ভূমির উপর নির্মিত হয়েছে বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র। ১৯৬৩ সালে রংপুরে বেগম রোকেয়ার নামে একটি কলেজ স্থাপন করা হয় এবং ১৯৭৯ সালে এটি জাতীয়করণ করা হয়। বাংলাদেশের ৭ম বিভাগ হিসেবে রংপুর বিভাগের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে 'রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়' ৮ই অক্টোবর ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২০০৯ সালে 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে তাঁর নামকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়' করা হয়। এছাড়াও, মহীয়সী বাঙালি নারী হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী হলের নাম 'রোকেয়া হল' করা হয়। বেগম রোকেয়ার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ৯ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ ডাক বিভাগ দু'টি স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করে।

নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং আলোর দিশারি বেগম রোকেয়ার জীবনকাল ছিল মাত্র বাহান্ন বছর। ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। সে সময় তিনি 'নারীর অধিকার' নামে একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন। বেগম রোকেয়া আজ নেই, তাঁর আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে। আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও মর্যাদা রক্ষায় আন্তরিক হলেই বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ও সংগ্রাম বাস্তব রূপ পাবে এই প্রত্যাশা।

সমাজসেবার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে নারীদের অধিকার নিয়ে মত তৈরির চেষ্টা করেছেন। মিসেস আর এস হোসেন নামে সেকালের বিখ্যাত পত্রপত্রিকায় তিনি অসংখ্য কবিতা, উপন্যাস ও নারীদের জন্য সমাজ সচেতনতা মূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বেগম রোকেয়া প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর লিঙ্গ সমতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা *সুলতানার স্বপ্ন*। এটিকে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে একটি মাইলফলক ধরা হয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো হলো: *পদ্মরাগ*, *অবরোধবাসিনী*, *মতিচুর। নবনূর*, *সওগাত*, *মোহাম্মদী* ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর লিঙ্গসমতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। হাস্যরস আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সাহায্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসম অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনা দিয়ে তিনি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, ধর্মের নামে নারীর প্রতি অবিচার রোধ করতে চেয়েছেন, শিক্ষা আর পছন্দানুযায়ী পেশা নির্বাচনের সুযোগ ছাড়া যে নারীমুক্তি আসবে না– তা বলেছেন। নারী সমাজের প্রতিপক্ষ নয়, নারী এই পৃথিবীর ঠিক অর্ধেক আকাশ আর নারীর জন্য হবে মুক্ত পৃথিবী। এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

রহিমা আক্তার মৌ: সাহিত্যিক ও কলামিস্ট

মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম শহরে কয়েকজন মা-বোনের ভূমিকা

আইউব সৈয়দ

জাতির জন্য, দেশের জন্য এবং সময়ের জন্য মানুষ কখন যে নিজেকে উপযুক্ত বিবেচনা করে, তা বলা কঠিন। কেননা, এ প্রক্রিয়ায় বুদ্ধির চাইতে আবেগের উচ্চারণ বেশি। আবেগের উচ্চারণ না হলে মানুষ কখনো একটি সংকটের সম্মুখীন হতে পারে না। বিবেচনার প্রশ্নটি থাকে ঠিকই, বুদ্ধির প্রয়োজনও থাকে। কিন্তু বিবেচনা এবং বুদ্ধি আমরা ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করি। আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয়। আকস্মিক সিদ্ধান্ত বললেও সে সিদ্ধান্তকে যুক্তিহীন বলা চলে না। কেননা আমাদের মানস চৈতন্যের একটা যুক্তি অবশ্যই আছে। আমাদের মন ক্রমান্বয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসে যা বাইরের আচরণে হয়ত প্রকাশ পায় না। বিভিন্ন ঘটনাক্রমের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে আমরা আমাদের মনকে একটি বিশেষ পরিবেশের জন্য প্রস্তুত করি। যখন সময় আসে তখন সে প্রস্তুতির সাহায্যেই আমরা অকস্মাৎ সিদ্ধান্ত নেই। এমনিতর সিদ্ধান্ত ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের ঘটনা সমগ্র চেতনায় স্থবিরতা এনে দেয়। ভেতরটা যেন এক ভয়াবহ শূন্যতায় এসে গ্রাস করে। জীবন রক্ষার তাগিদে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় অনেকে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার। হাজার বছরের ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে আমাদের মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে তিলে তিলে এগিয়েছে স্বাধিকারের দিকে। শুরু হলো প্রতিরোধ আর যুদ্ধ। পুরো ঐক্যবদ্ধ জাতি আলো-বাতাস কাদাজলের সাথে মিশে লড়েছে কৌশলে। আমরা আলজেরিয়ার জামিলার কথা যেমন জানি তেমনি করে পড়েছি জেনেছি প্যালেস্টাইনের বিপ্লবের সাথে বাক্‌দত্তা অগ্নিকন্যা লায়লা খালেদার। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে খুঁজে পাব হাজারো জামিলা, লায়লাকে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করেছে প্রয়োজনে বাংলার নারীরাও যোদ্ধা হতে পারে। হাতে তুলে নিতে পারে অস্ত্র। প্রেমের হৃদয়ে বিস্ফোরিত হতে পারে হুঙ্কারে।

চট্টগ্রাম হাজারো ঐতিহ্যের স্মৃতির মিনার। এ মাটির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন প্রীতিলতা। সৃষ্টি করেছেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। সেই প্রীতিলতার পথ ধরে আমাদের মায়েরা-বোনেরা পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা, যা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। ১লা মার্চের পর থেকে চট্টগ্রামের কয়েকজন নারীর ভূমিকা ছিল অনন্য। তাঁদের কারো নাম পাওয়া গেছে আবার কারো নাম আজও বিস্মৃতির অতলে। মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা– সেদিন ছিল ২৮শে মার্চ। সকাল থেকে কোর্টবিল্ডিংকে ঘিরে তুমুল লড়াই। তীব্র যুদ্ধের পর কৌশলগত পিছিয়ে আসেন এবং আহত হন অনেকে। কালবিলম্ব না করে এগিয়ে এলেন এক মহীয়সী মা কুন্দপ্রভা সেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পাথরঘাটা এলাকায় আহতদের চিকিৎসা করার জন্য কাজ শুরু করে দেন। তারপর শিববাড়িতে খোলা হয় সেবা কেন্দ্র। কয়েক দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের চেহারা পাল্টে যায়। শহর নীরব। শহরে গড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় বেইজ। মে মাসের মাঝামাঝি ভারত থেকে ট্রেনিং করে মুক্তিযোদ্ধারা আসতে শুরু করেছে। শহরে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু গোপন শেল্টার। সেই শেল্টারগুলোতে গুরুদায়িত্ব পালন করেন কিছু নারীরা। তখন রোজা শুরু হয়নি। আগ্রাবাদ জাম্বুরি মাঠে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় রয়েছে একটি বড়ো বিদ্যুৎ পাওয়ার স্টেশন। এ স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হতো ইস্পাত কারখানায়। তাই অপারেশনের সিদ্ধান্ত হলো। মোগলটুলীর মাতব্বর বাড়ি থেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক অপারেশনের আগে সেখানে পৌঁছাতে হবে।

এই দায়িত্ব নিলেন মুক্তিযোদ্ধা গরীবউল্লাহর মা- হাজেরা খাতুন ও ভাবি- হাফিজা খাতুন। বাড়ির সামনে ডেকে আনলেন একটি ট্যাক্সি। ট্যাক্সির চারদিকে শাড়ি দিয়ে ঢেকে ফেললেন। সাথে কাপড় ভর্তি সুটকেস। হাতে বড়ো সাইজের মিষ্টির প্যাকেট। ট্যাক্সি জিন্নাহ রোডে এলে দখলদার বাহিনী তাদের চেক করে ছেড়ে দেয়। পরে ফয়েজুর রহমান তাদের রিসিভ করলেন। সুটকেসের ভেতর ছিল ২টি স্টেনগান গ্রেনেড আর মিষ্টির প্যাকেটে প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক। এই ২ নারীর বহন করা অস্ত্র দিয়েই আগ্রাবাদ জাম্বুরি মাঠ পাওয়ার স্টেশন বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।

হাজীপাড়ার সকিনা খাতুন। এ যুগের মাদার তেরেসা বলা চলে। তিনি কখনো মায়ের ভূমিকায় কখনো দাদির ভূমিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পালন করেছেন সুমহান দায়িত্ব। অপারেশন জ্যাকপটের নৌ-কমান্ডোদের কয়েকজন এবং তাদের অস্ত্রগুলোও ছিল সেই দাদির নেক নজরে। পানওয়ালা পাড়ার মনুর বাড়ির সালমা ও লায়লা খাতুন– অস্ত্র হেফাজতসহ প্রতিদিন যোদ্ধাদের খাওয়াতেন। এমন কী তাদের পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে দিয়েছেন। নৌ-কমান্ডোদের আশ্রয় কেন্দ্র কাকলী। সে বাড়ির মা মিসেস মাওলা। আশ্রয়, আর্থিক সাহায্য ও নৌ-অপারেশনের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। দেওয়ান শামসুন্নাহার বেগম- আবাস ছিল নালাপাড়ায়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াতেন এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রচারপত্র গোপনে বিলি করতেন। তাছাড়া পাঠানটুলীর কাপুড়িয়া পাড়ার গফুর সওদাগরের বাড়ির মোসলেম খানের স্ত্রী নূরুন নাহার বেগম, ফিরিঙ্গিবাজার ব্যাপ্টিস্ট চার্চের এইচ আর চৌধুরীর মিসেস চৌধুরী, সদরঘাট দৌলতুর রহমানের বাড়ির কর্ত্রী আসিয়া রহমান, শুলকবহর ভাসানীলজের ডা. চেমন আরা, পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকার ওসমান আরা বেগম, দিল আফরোজ, হাসনা রহমান অবদান কম নয়। চট্টগ্রাম শহরের মুক্তিযোদ্ধা সহযোগী নারীদের আংশিক চিত্র তুলে ধরেছি মাত্র ।স্বাধীনতা আবেগমাত্র নয়, একটি নতুন চেতনা ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন। মানুষের ঘনীভূত আবেগ স্বাধীনতার প্রেক্ষিত নির্মাণ করেছিল অসীম সাহস, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও মরণপণ লড়াইয়ের ইন্ধন জুগিয়েছিল– অবশেষে স্বাধীনতার প্রদীপ্ত মশাল জ্বালিয়েছিল। তাই স্বাধীনতা যেমন একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন, তেমনি নতুন স্বপ্নের উৎসাধন। আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও বীরগাথার গৌরবময় স্মৃতিকে লালন করা দরকার। এগুলো আমাদের স্বকীয় উজ্জীবনের প্রেরণা আগামী দিনের পথ চলার নিশানাও বটে ।

আইউব সৈয়দ: কবি, প্রাবন্ধিক ও মুদ্রণশিল্পী
ayub.bookshop@gmail.com

বন ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় দুটি অধ্যাদেশ পাস

দেশের বন, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ ৪ঠা ডিসেম্বর পাস করা হয়। ঢাকায় তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০২৫' এবং 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ ২০২৫' অনুমোদন দেওয়া হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়নের চাপ, অবৈধ দখল, বনভূমি উচ্ছেদসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন 'বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০২৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অধ্যাদেশে প্রাকৃতিক বন রক্ষা, বনভূমির রেকর্ড ও সীমানা সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা, উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ দখল প্রতিরোধ, অবক্ষয়িত বন পুনরুদ্ধার, আগ্রাসী প্রজাতি নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তনযোগ্য ও কর্তন নিষিদ্ধ বৃক্ষের তালিকা হালনাগাদের মতো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২' মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার পরিবর্তনের কারণে নতুন 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ ২০২৫' প্রণীত হয়েছে। নতুন অধ্যাদেশে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ, শিকার, পাচার, হত্যা ও বাণিজ্যিক ব্যবহার নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানিয়েছেন, পাস হওয়া এই দুটি নতুন অধ্যাদেশ বনসম্পদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দেশের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে পরিবেশগত নিরাপত্তা জোরদার হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ প্রকৃতি সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন: শিহাব শুভ

খুকু রাণীর সাক্ষ্যে নাথপাড়া-আবদুপাড়া গণহত্যা

ফারুক মুনির

২৫শে মার্চের সেই কালরাত। ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও চলে নিরীহ বাঙালির ওপর পাক হায়েনাদের অতর্কিত হামলা। হালিশহরস্থ ইপিআর তথা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ক্যাম্পে পশ্চিমা হায়েনারা শুরু করল বাঙালি সৈনিক নিধন। তার আগে ইপিআর কমান্ডার বাঙালি সৈনিকদের দায়িত্ব এমনভাবে বণ্টন করেন যাতে তারা সবসময় সশস্ত্র থাকতে পারেন। শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ, চলে ৩০শে মার্চ রাত পর্যন্ত। রাতের শেষভাগে ইপিআর সৈনিকরা ২ জন, ৫ জন, ১০ জন এভাবে ভাগ হয়ে ক্যাম্প এলাকা ছেড়ে যুদ্ধের জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন।

৩১শে মার্চ সকালে কয়েকজন বাঙালি জোয়ান সংগঠিত হয়ে আবার প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেন। তারা আশ্রয় চান পার্শ্ববর্তী নাথপাড়া আর আবদুপাড়ায়। দুইপাড়ার মানুষজন ইপিআর জোয়ানদের দেখে মনে সাহস পায়। তারাও শপথ নেয় কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে।

কিন্তু জোয়ানদের আশ্রয় দেওয়া, তাদের সহায়তা করায় এই দুই পাড়ায় বসবাসকারীদের জীবনে কী সর্বনাশ ডেকে আনবে তা কাকপক্ষীও টের পায়নি। চোখের পলকেই এক জীবন্ত নরকে পরিণত হয় নাথপাড়া-আবদুপাড়া। নিরবালা দেবীর কোল থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে ছেলের শরীর টুকরো করে মায়ের শরীরে রক্ত ঢেলে পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল বিহারি জল্লাদরা।

হরিরঞ্জন নাথের ছেলে দুলালের ঘাড়ে কিরিচ দিয়ে কোপ দিল, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মাথা! পুত্রের লাশের উপর পিতা আছড়ে পড়লে পুত্রের লাশের ওপরেই জবাই করা হয় পিতাকে! ভাইয়ের জন্য ভাই আর্তনাদ করতেই সেই ভাইকেও হত্যা করা হয় ভাই-ভাতিজার লাশের উপর। এমনি নির্মম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল সেদিনের নাথপাড়া, আবদুপাড়াবাসী।

শহিদ হরিরঞ্জনের মেয়ে খুকু রাণীর মুখেই শুনি সেদিনে ঘটনা!

আমি তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। সকালবেলা দরজা ধাক্কানোর শব্দ। এপাশ থেকে জিজ্ঞেস করা হলো কে? ওপাশ উত্তর এলো 'আমরা ইপিআর সদস্য। আমাদের ক্যাম্প আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের আশ্রয় দিন।' অর্ধশতাধিক মুক্তিকামী ইপিআর সদস্যকে আশ্রয় দিলো নাথপাড়াবাসী।

'আশ্রয় নেওয়া ইপিআর সদস্যদের খাওয়াদাওয়ার সব ব্যবস্থা করা হলো। আমাদের ভাই-বাবারা তাঁদের আশ্বস্ত করলেন আমরা একসঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করব। সকাল ১০টার দিকে প্রচণ্ড গোলাগুলি। আমরা পুকুরপাড়ের মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। এরই মধ্যে বেলা একটার দিকে একদল লোক এসে দরজায় ধাক্কা দিলো। আমরা ভেবেছিলাম তারা মুক্তিযোদ্ধা কিংবা ইপিআর সদস্য। পরে বুঝলাম এরা শত্রুপক্ষ।

৭১-এর পাশবিকতার ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছেন খুকু রাণী

'বাড়ির ভেতর ঢুকে তারা চালালো হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগসহ নারকীয় তাণ্ডব। আমার বাবা, ভাইদের লাশ দেখে আমি জ্ঞান হারালাম। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আমার চারপাশে লাশের স্তূপ। বামপাশে আগুন জ্বলছে। এক সময় বুঝলাম আগুনে আমার শরীরের একাংশ ঝলসে গেছে। ঝলসানো শরীরে একটু প্রশান্তির আশায় আমি লাফ দিলাম সামনের পুকুরে। পুকুর থেকে উঠে পাশের আবদুপাড়ায় গেলাম। কেউ আমারে চিনতেছিল না। পরিচয় দেওয়ার পর ঘরে নিয়ে খাবার দিলো, চিকিৎসা করালো।'

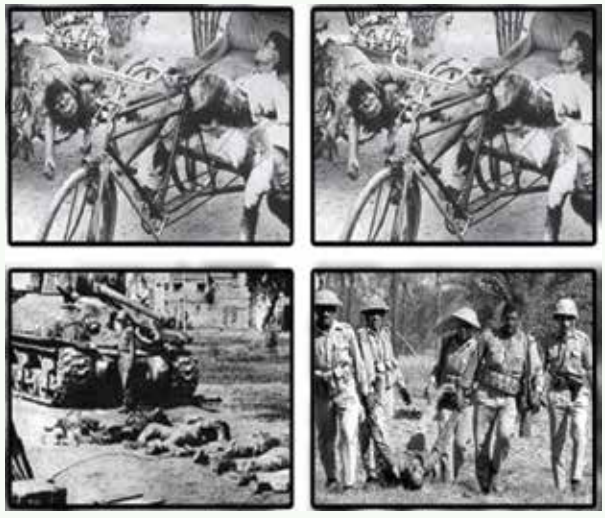

অব্যক্ত কথাও আছে...

অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া খুকু সেদিন শুধু আগুনে দগ্ধ হননি, হারিয়েছিলেন সম্ভ্রম। সেই ক্ষত আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন খুকু রাণী। এই সমাজ তাকে স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ দেয়নি, হয়নি ঘরসংসার। চোখের সামনে নিজের পিতা, বড়ো ভাই, ছোটো ভাই, আপন চাচাসহ অর্ধশতাধিক স্বজনের নির্মম মৃত্যু নিজের চোখে দেখা, নিজের সম্ভ্রম হারানোর ইতিহাস অনেকবার বলেছেন অনেককে। সবাই শুনেছেন, গণমাধ্যমেও প্রচার হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তাদের স্বীকৃতির জন্য চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য কারণে মেলেনি স্বীকৃতি। খুকু রাণী এখন জীবনের পড়ন্ত বেলায়। অসুস্থ শরীরে যেন চাইছেন শান্তির মৃত্যু!

প্রত্যক্ষদর্শী কুঞ্জবালার কাছ থেকে শোনা সেদিনের চিত্র–

নাথপাড়া গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন কুঞ্জবালা। সেদিনের দেখা দৃশ্য নিয়ে তিনি বলেন, তারা যাঁকে পেয়েছে তাঁকে কুপিয়েছে। দরজার পাশেই খুকু রাণীর বড়ো ভাই দুলালকে কিরিচ দিয়ে কোপ দিলো বিহারিরা। দেহ থেকে মাথা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে মূর্ছা গেল খুকু ও নিরবালা। একসময় তাঁদের আরেক ভাই বাদল নাথকে নিয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়েছিল খুকু। বাদল ছিল দুধের শিশু, শেষরক্ষা হয়নি। বোনের বুক থেকে বাদলকে টেনে এনে হত্যা করল। শুধু তাই নয়, খুকু রাণীর কাকিমার কোলের শিশুটি নিয়ে ছুঁড়ে মারল দূরে।

মহান স্বাধীনতার জন্য স্বামী আর দুই সন্তানকে চোখের সামনে শহিদ হতে দেখা নিরবালা দেবী (খুকুর মা) ২০০৮ সালের মার্চের ২ তারিখ ডানা মেলে আকাশের পানে ছুটে গেলেন। সেদিন ঘাতকেরা তাঁর গর্ভজাত ছেলের রক্ত দিয়ে স্নান করালো তাঁকে, শত আকুতি সত্ত্বেও চোখের সামনে কুচি কুচি করল তাঁর নাড়ি ছেঁড়া সন্তান দুলাল, বাদল আর স্বামী হরিরঞ্জন নাথসহ অনেক স্বজনকে।' ৭১-এর সেই বীভৎস ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নিরবালা দেবী চলে গেলেও রেখে গেছেন সেদিনের আরও অনেক প্রত্যক্ষদর্শী।

শুধু নাথপাড়ায় নয়, ঘাতকরা সেদিন হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল পাশের আবদুপাড়ায়ও। সেখানে আজগর আলী, ইসহাক, বাবুল হক, সিদ্দিক আহমদসহ অনেকেই শহিদ হয়েছেন খুনিদের হাতে। এই দুটি পাড়ায় সেই ৩১শে মার্চ দুপুরে শতাধিক বাঙালি নিহত হলেও অনেকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে ইপিআর সদস্যদের পরিচয় জানা যায়নি।

স্বাধীনতার এত বছর পরও এই দুই পাড়ার কারোরই মেলেনি শহিদ পরিবারের মর্যাদা, সম্ভ্রম হারানোদের স্বীকৃতি। অনেকে অনেক আশার বাণী শুনিয়েছেন তাঁদের। উল্লেখ করার মতো কিছুই জুটেনি তাঁদের ভাগ্যে। তাঁরাতো অর্থ-কড়ি চান না। চান শুধু রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, একটু মর্যাদা। তাঁদের প্রাপ্তি বলতে– শিল্পী ঢালী আল মামুনের ডিজাইনে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ট্রাস্ট ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় ২০০১ সালে নির্মিত একটি শহিদবেদি। এছাড়া আর কিছুই পাননি তাঁরা।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান বলেন, নাথপাড়ার গণহত্যা অন্য গণহত্যার নির্মমতার বিচারে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। আমরা অনেক চেষ্টা করেও নাথপাড়া, আবদুপাড়াবাসীর জন্য কিছু করতে পারিনি। শেষ একটি শহিদবেদি তৈরি করে দিয়েছি। সেটিও এখন অযত্ন অবহেলায় আছে। তিনি আরও বলেন, যাদের সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমাদের এই যশ-খ্যাতি অর্জন, তাঁদের আত্মার অভিশাপে যদি এ অর্জন কোনোদিন মুখ থুবড়ে পড়ে তখন অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ফারুক মুনির : স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক কালের কণ্ঠ

প্রকাশিত হলো প্রথম জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রস্তুতি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

নৈতিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবকেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রস্তুতি মূল্যায়ন (Artificial Intelligence Readiness Assessment) প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০শে নভেম্বর ঢাকার আইসিটি টাওয়ারে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ, এটুআই, জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

অনুষ্ঠানে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রকাশিত হলো যখন বাংলাদেশ এমন এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর যুগে প্রবেশ করছে, যেখানে এখন নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো আগামী কয়েক দশক ধরে সমাজকে প্রভাবিত করবে। তিনি বলেন, এই প্রতিবেদন আমাদের স্পষ্টভাবে দেখায় আমরা কোন অবস্থানে আছি এবং কোন বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের বিচারের বিকল্প না হয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরো শক্তিশালী করে এবং নাগরিকদের শোষণ না করে তাদের অধিকার সুরক্ষিত করে।

আইসিটি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী চলমান নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

এইডস: আতঙ্ক নয় চাই সচেতনতা

মো. ফুয়াদ হাসান

১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়– 'সব বাধা দূর করি, এইডস মুক্ত সমাজ গড়ি'। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়ে আসছে। ১৯৮৮ সালে গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক এইডস সোসাইটি এবং সে বছরই ১লা ডিসেম্বরকে বিশ্ব এইডস দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে এই দিবস পালনের সূচনা। দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এইডস-এর প্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করা হয় লাল ফিতা বা রিবন। লাল ফিতার মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের প্রতি সহমর্মিতাসহ প্রতিরোধের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

আমাদের প্রথমেই জানা দরকার এইডস কী? AIDS হলো এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা গঠিত রোগ। যে রোগ HIV নামক ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে। অন্যদিকে Acquired Immune Deficiency Syndrome-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে AIDS। এইচআইভি একটি ভাইরাস, যা মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া এই ভাইরাসটি রক্তের সাদা কোষ (সিডি-৪ বা টি সেল) নষ্ট করে দেয়, যার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে এইডস রোগে আক্রান্ত হওয়া। তবে এইচআইভি এবং এইডস কিন্তু একই বিষয় নয়। এইচআইভি একটি ভাইরাস এবং এইডস একটি অসুস্থতা, যা এইচআইভির কারণে হয়।

বর্তমানে এইডস একটি মারাত্মক রোগ হিসেবে বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এইডস সর্বপ্রথম ১৯৮১ সালে আমেরিকায় আবিষ্কৃত হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রক্ত পরিসঞ্চালনের আগে রক্তে এইচআইভি ভাইরাস জীবাণুমুক্ত কি না স্ক্রিনিং করে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল রক্ত সরবরাহ করার পরামর্শ দেয়। এইডস রোগের বাহক হলো অতিক্ষুদ্র এক বিশেষ ধরনের ভাইরাস। এই ভাইরাস দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন সেলকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলে। ফলে মানবদেহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই এইডস ভাইরাসকেই Human Immune Virus বা এইচআইভি (HIV) বলা হয়। এইচআইভি সংক্রমণের সর্বশেষ পর্যায় হলো এইডস। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য ছিল একসময়, তাই তখন এই রোগকে ঘাতক রোগ বলা হতো ।

H = Human (মানুষ)
I = Immune-deficiency (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি বা হ্রাস)
V = Virus (ভাইরাস/জীবাণু)
অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতির লক্ষণ সমষ্টিকে এইডস বলে।
A = Acquired (অর্জিত)
I = Immune (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা)
D = Deficiency (ঘাটতি/হ্রাসজনিত)
S = Syndrome (অবস্থা/রোগের লক্ষণ/ উপসর্গসমূহ)

এইডস কীভাবে ছড়ায় বা এ রোগের কারণগুলো কী কী?

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, জীবদেহে বিভিন্নভাবে 'এইডস' রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। 'এইডস' আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা বীর্য বা জরায়ু রসের সঙ্গে যদি সুস্থ কোনো ব্যক্তির রক্ত, শরীর রস বা মিউকাস আবরণের সংস্পর্শ ঘটে, তবে এইচআইভি তথা এইডস রোগের বিস্তার ঘটে। এসব সংস্পর্শ নানাভাবে ঘটতে পারে। যেমন– অনিরাপদ বা কনডম ব্যবহার না করে অবাধ যৌন সহবাস; এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে ধারণ বা গ্রহণ; অঙ্গ প্রতিস্থাপন বা দাঁতের চিকিৎসা বা অপারেশনসহ আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ব্যবহার; এমনকি সংক্রমিত গর্ভবতী নারী থেকে শিশুর দেহে পর্যন্ত এ রোগ ছড়াতে পারে। এইচআইভি ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়তে সাধারণত ৩ থেকে ৬ মাস সময় নেয়। ক্ষেত্রবিশেষে রোগীর লক্ষণ প্রকাশ ছাড়া ১৫ বছর পর্যন্ত বাহক পর্যায়ে থেকে যেতে পারে। বাহকদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগের ক্ষেত্রে ৮ বছর এবং ৫০ ভাগের ক্ষেত্রে ১৫ বছর পর এ এইডস রোগ বিকশিত হয়।

এইচআইভি রোগী শনাক্তে বাড়ছে বৈচিত্র্য

সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে সাম্প্রতিক সময়ে যেসব নতুন এইচআইভি রোগী শনাক্ত হচ্ছেন, তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ তরুণ, যাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। পাশাপাশি বিদেশফেরত শ্রমিক এবং দুই পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্কে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে যুক্ত কিছু ব্যক্তির শরীরেও শনাক্ত বাড়ছে। এইচআইভি রোগীরা নিয়মিত বিনামূল্যে ওষুধ পেলেও জটিল রোগীর চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশেষায়িত ল্যাবরেটরি, এমআরআই, বায়োপসি, সিডি-৪

কাউন্টের মতো পরীক্ষার সুবিধা এখানে নেই। ফলে রোগীকে এসব পরীক্ষা বাইরের প্রতিষ্ঠানে করাতে হয়।

এইডসের উপসর্গ বা লক্ষণগুলো হলো:

* এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের ওজন হ্রাস পেতে থাকে।
* আক্রান্ত ব্যক্তির গ্ল্যান্ড ফুলে ওঠে।
* দীর্ঘমেয়াদি জ্বর থাকে।
* যে-কোনো সময় রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে।
* দীর্ঘমেয়াদি শুকনো কাশির প্রভাব অব্যাহত থাকে।
* মুখের অভ্যন্তরে ঘা সৃষ্টি হয়।
* শরীরের যে-কোনো স্থানের চর্মে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
* রাতে প্রচুর ঘামের সৃষ্টি হয়।
* কৃমির প্রভাব দেখা দেয়।
* নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে পড়ে।
* মস্তিষ্কে প্রদাহ সৃষ্টি হয়।
* স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি ঘটে।
* স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।

যেসব কারণে এইডস ছড়ায় না

এইচআইভি ছড়ানোর কারণ নিয়ে মানুষের মধ্যে নানা প্রকার ভুল ধারণা রয়েছে। এইচআইভি সংক্রমণ ছোঁয়াচে নয়। আলোচিত কারণগুলো ছাড়া সাধারণত এইচআইভি ভাইরাস ছড়াতে পারে না। যেমন- একইসঙ্গে কাজ করলে, একইসঙ্গে খাবার খেলে, একইসঙ্গে ঘুমালে, হাত মেলালে, কোলাকুলি করলে, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে, একই পুকুরে গোসল করলে, একই ওয়াশরুম ব্যবহার করলে, মশা-মাছির কামড়ের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায় না।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

দেশে এক বছরে নতুন এইচআইভি এইডস রোগী বেড়েছে প্রায় ৩৯ শতাংশ। ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নতুন করে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছেন আনুমানিক দুই হাজার মানুষ। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল এক হাজার ৪৩৮ জন। এ সময় এইডসে মারা গেছেন ২০০ জন, যা আগের বছর ছিল ১৯৫। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ও এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির (টিবি-এল অ্যান্ড এএসপি) প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, নতুন শনাক্ত রোগীর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই সমকামী পুরুষ। ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ ও চিকিৎসা পরামর্শ না নেওয়ার কারণে রোগী বাড়ছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে ঢাকা বিভাগে। ঘনবসতি, অনিয়ন্ত্রিত আচরণ এবং উচ্চ ঝুঁকির জনগোষ্ঠীর একাংশ চিকিৎসার আওতায় না আসায় রাজধানীতে রোগী বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, দেশে ১৯৮৯ সালে প্রথম এইচআইভি শনাক্ত হওয়ার পর এবারই এক বছরে আক্রান্ত সর্বোচ্চ। বর্তমানে শনাক্ত মোট এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ১৬ হাজার ৮৬৩ জন। তাদের মধ্যে দুই হাজার ২৮১ জন মারা গেছেন। এখনও চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং নিয়মিত সেবা পাচ্ছেন আট হাজার ৩০৯ জন রোগী।

রাজধানীর মহাখালীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এখানে এইচআইভি সন্দেহে দুই হাজার ৪৮৬ জনের পরীক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে ১৮৪ জনের এইচআইভি সংক্রমণ শনাক্ত হয়। শনাক্ত ব্যক্তির মধ্যে পুরুষ ১৪১, নারী ৩৮ ও হিজড়া চারজন।

হাসপাতালের তথ্য বলছে, আক্রান্তদের মধ্যে ১০৭ জন বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়েছেন। মা-বাবার মাধ্যমে জিনগত সংক্রমিত হয়েছেন ১০ জন। প্রবাস থেকে সংক্রমণ নিয়ে দেশে ফিরেছেন ৪২ জন। একই সময়ে হাসপাতালে এইডস সম্পর্কিত জটিলতায় ৩২ জনের মৃত্যু হয়; তাদের মধ্যে সাতজন চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই মারা যান।

পরবর্তী সময়ে ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে এই বছরের অক্টোবর পর্যন্ত হাসপাতালে দুই হাজার ১৯২ জনের পরীক্ষা করা হয়। এ সময় ২৭৩ জনের শরীরে এইচআইভি ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে পুরুষ ২১৫, নারী ৫৭ ও হিজড়া একজন। বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) সাবেক উপাচার্য নজরুল ইসলামের মতে, এখন এইচআইভির চিকিৎসার ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। তবু আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যু বাড়ছে। এটার কারণ খোঁজা জরুরি। একটা কারণ হতে পারে, নিয়মিত ও যথাযথ চিকিৎসা নিচ্ছেন না আক্রান্ত ব্যক্তিরা। আবার যেসব ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, তা প্রতিরোধী হয়ে উঠছে কি না, সে বিষয়েও নজর দেওয়া দরকার। এছাড়া সমকামীদের মধ্যে নতুন শনাক্তের হার যেভাবে বাড়ছে, তা এখনই নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা জোরদার না করলে ভবিষ্যতে বড়ো স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

ঘাতক এইডস রোধকল্পে উন্নত দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এইডসের প্রতিষেধকও একদিন হয়ত আবিষ্কার হবে। তবে তার আগে এর প্রতিকারের বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নিলে ঘাতক এইডসের ছোবল থেকে মানুষ তার অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারবে, এতে সন্দেহ নেই। যেমন–

* অবাধ যৌনাচারের অপসংস্কৃতি বর্জন।
* নিরাপদ ও বিশ্বস্ত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন।
* ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ।
* মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা।
* যৌন মিলনের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ব্র্যান্ডের কনডম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
* রক্ত সংগ্রহের আগে রক্তদাতার রক্ত পরীক্ষা করা।
* গর্ভাবস্থায় মায়ের এইডস ছিল কি না তা পরীক্ষা করা।
* এইডস আক্রান্ত রোগীর জীবনবৃত্তান্ত চিকিৎসকের জেনে নেওয়া।
* আক্রান্ত ব্যক্তির অন্য কোথাও রক্ত নিয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা।
* সুচ-সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করা।
* প্রচার মাধ্যমগুলোকে এ ব্যাপারে সক্রিয় করা।

মো. ফুয়াদ হাসান: প্রাবন্ধিক

রক্তদান কর্মসূচিতে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে কর্মকর্তাবৃন্দ তত্ত্বাবধান করেন

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)'র মাসব্যাপী কার্যক্রম

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) নিয়মিত কাজের পাশাপাশি মহান বিজয় দিবসকে উপলক্ষ্য করে ডিসেম্বর মাসজুড়ে নানাবিধ মানবিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম আয়োজনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ডিসেম্বর মাসে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ:

রক্তদান কর্মসূচিতে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাকে সনদ প্রদান

রক্তদান কর্মসূচি

আর্তমানবতার সেবায় ত্যাগের মহান ব্রত নিয়ে ৮ই ডিসেম্বর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচিতে সর্বমোট ৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও এতে অংশগ্রহণ করেন। মানবিক এই উদ্যোগের সার্বিক তদারকি করেন দপ্তরের মহাপরিচালক এবং সহযোগিতা করেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ; যা দপ্তরের সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পতাকা উৎসব ও আলোকসজ্জা

চলতি বছরের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ই ডিসেম্বর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় পতাকা উৎসব; যেখানে

পুরো অফিস লাল-সবুজের জাতীয় পতাকায় সুশোভিত করা হয়। ১৫ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে ডিএফপি'র প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভবনসমূহকে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। এ আয়োজনের মাধ্যমে বিজয়ের আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে ডিএফপি।

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বিনিময়

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৭ই ডিসেম্বর অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন হয়। মহাপরিচালকের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে কেক কাটা এবং শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বিনিময়ের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উদ্‌যাপন করেন। এ আয়োজনে বিজয়ের আনন্দ ও উৎসবমুখর এক আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় তথ্য ভবনে।

'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা' শীর্ষক সেমিনার

১৮ই ডিসেম্বর অধিদপ্তরের সভাকক্ষে 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তারা বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন দপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে নীতি সহায়তা, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাজেদুল ইসলাম, চলচ্চিত্র নির্মাতা, গবেষক ও শিক্ষক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বর্তমানে এক পরিবর্তনশীল সময় অতিক্রম করছে। তিনি মৌলিক গল্প, গবেষণাভিত্তিক চিত্রনাট্য এবং শিল্পসম্মত নির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়া আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন মো. জাহিদুল ইসলাম, পরিচালক (চলচ্চিত্র), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। তিনি চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। আলোচক ফজলে হাসান শিশির, (চলচ্চিত্র প্রযোজক ও কিউরেটর) তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে টেকসই করতে প্রযোজনা ও প্রদর্শন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন অপরিহার্য। পাশাপাশি সরকারি

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীদের সনদ প্রদান

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ

নীতিগত সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা বাড়লে মানসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণ আরও গতিশীল হবে।

সেমিনারের সঞ্চালক মুহা. শিপলু জামান, পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশনা) সামগ্রিক আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরে বলেন, এমন আয়োজন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের মধ্যে চিন্তা ও মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট আরো সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ২২শে ডিসেম্বর ডিএফপি প্রাঙ্গণে এক উৎসবমুখর পরিবেশে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতা বয়স ভেদে ৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়; গ্রুপ-ক (৫-৮ বছর), গ্রুপ-খ (৮-১১ বছর) এবং গ্রুপ-গ (১১-১৪ বছর)। সর্বমোট ৫২ জন শিশু-কিশোর এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী ও সকল অংগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। এছাড়া ৮ই ডিসেম্বর 'রক্তদান কর্মসূচি'তে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিশেষ পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ, ডিএফপি

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সনদ হাতে প্রতিযোগীরা

অনিবার্য গন্তব্য

রফিকুর রশীদ

যুদ্ধে যাবার কোনো কথাই ছিল না লোকটার।

জীবনযুদ্ধে তাড়া খাওয়া, তাড়া খেয়ে দৌড়ানো, দৌড়াতে দৌড়াতে কুকুরের মতো জিভ বেরিয়ে পড়া অতি সাধারণ জীবন ছিল তার। সাত চড়ে রা নেই। রক্তের ভেতরে লেজে পা পড়া ফণা নেই। একেবারে নিরীহ নির্বিবাদী সাধারণ মানুষ। যুদ্ধের, তাও আবার মুক্তিযুদ্ধ, দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পথ বেয়ে একটি নিপীড়িত জাতি প্রবেশ করছে যে মুক্তিযুদ্ধে সে যুদ্ধের কী বুঝবে! বুঝের জায়গাটা অতো ঝরঝরে পরিষ্কার হলে তো সেও অসাধারণ কত কিছু হয়ে যেত। বিদ্যের জাহাজ ভদ্দরলোক কিংবা নিদেনপক্ষে ন্যাপ-নেতা আলতাফ মাস্টার হয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং মিছিল করতে পারত, লাঙল যার জমি তার... এই সব সাতকাহন গেয়ে গলা ফাটাতে পারত, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, তারই বাড়ির দুয়ারে বটতলার মোড়ে প্রত্যেক সপ্তাহান্তে মিটিং করে আলতাফ মাস্টারের লোকজন। এ তলাটের কত লোক হাজির হয় সেই মিটিংয়ে, গলার রগ কাঁপানো বক্তৃতা হয়, গগনবিদারী স্লোগান ওঠে, গ্রাম্য রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে মিছিল বেরোয়– সে কোনোদিনই যায়নি এসবে। গা করেনি মোটেই। এই সব হইচইয়ের মধ্যে নাক গলানোর বিষয়ে কখনো ভেতর থেকে বিশেষ কোনো সাড়া পায়নি। হ্যাঁ, সেও শুনেছে বটে মিলিটারি দাবড়ে বেড়াচ্ছে দেশের বিভিন্ন

প্রান্তে, ঢাকায় মানুষ মেরে ফেলেছে হাজার হাজার, তবু সেই আঁচে মোটেই উত্তপ্ত হয়নি সে।

গত নির্বাচনে সবাই যেখানে ভোট দিয়েছে, সেও সেই একই বাক্সে ভোট দিয়েছে। স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো আহাম্মক সে নয়। ভোটের রেজাল্ট যা হবার তাই হয়েছে। অস্বাভাবিক কিংবা অভাবিত কিছু নয়। কাজেই এ নিয়ে সে উল্লাসে ফেটেও পড়েনি, উদ্বেগে অস্থিরও হয়নি। বরং চারপাশের মানুষজনের কাণ্ডকারখানা দেখে সে খানিক অবাক হয়েছে। বাব্বা! সবাই যেন ঝানু রাজনীতিঅলা। ভোট বেরিয়ে গেছে সেই কবে, তবু কারো মাথায় থেকে ভোটের ভূত যেন নামতেই চাইছে না। ঘর-গেরস্থালির খবর নেই, দু'দশজন এক জায়গায় হলে সেই একই রাজনীতির প্যাচাল, ভোটের কথা, মুখে একই আলোচনা, ফিসফাস, চাপা উত্তেজনা, আবার আকাশ কাঁপানো স্লোগান চলছেই। এসব নজরে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সে কিছুতেই মাথা গলাতে চায়নি। দিনের বেলায় গেরস্থের মাঠঘাট আর রাতের বেলায় স্ত্রী-পুত্র এই বৃত্তের মধ্যেই সে তার নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপনে মগ্ন ছিল। তার যেটুকু উদ্বেগ তা শুধু পেটের ধান্দা নিয়ে, যুদ্ধ নিয়ে নয়।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন চোখের সামনে আকাশ ভেঙে পড়ল খোলামকুচির মতো খান-খান হয়ে, ঘোর ঘোর পাখি ডাকা ভোর অকস্মাৎ তার সামনে চৈতি দুপুর হয়ে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল, সে একেবারে হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সম্মুখে দণ্ডায়মান গমের দানার মতো ফর্সা ধবধবে সাক্ষাৎ যমদূত, উর্দু জবানে গমগমে ধমকানি– কিধার যাতা হ্যায়?

জবাব দেবে কী! তার ডান হাতের মুঠো থেকে খসে পড়ে পানি ভর্তি পেতলের বদনা। কী ঘটছে সে বুঝে উঠতে পারে না। এরই মধ্যে ঘাড়ের উপর এক রদ্দা এবং অপরিচিত ভাষায় সেই অচেনা প্রশ্নের ধমকানি। এবার বাম হাতের আঙুল গলিয়ে খসে পড়ে ধূমায়িত বিড়ির পাছা। তার দু'হাতই এখন মুক্ত। মুক্ত দু'হাত তুলে জোড়হাত করে এবং কম্পিত কণ্ঠে কোনোরকমে উচ্চারণ করে– বাহ্যি করতি হুজুর!

এদিকে প্রশ্নকর্তার আবার ঐ বাহ্যি শব্দের সাথে পরিচয় নেই, ফলে কাঁধে ঝুলানো রাইফেলের বাটের এক ঘা তার পশ্চাৎদেশে বসিয়ে জানতে চায়– বাহ্যি কিউ? এ প্রশ্ন শুনে বাহ্যি তার মাথায় ওঠে, মগজের ঘিলু হয়ে যায়। বাহ্যি বিষয়টা যে কী, কেমন করে বুঝাবে সে ভেবে আকুল হয়। নিরুপদ্রব দু'দণ্ড ভাববারও কি জো আছে তার! সে আছে তপ্ত কড়াইয়ের ফুটন্ত মুড়ির দশায়, ভাববে কখন! কিল ঘুসি, থাপ্পড়, রাইফেলের গুঁতো– এইসব নির্যাতনেরও বোধ হয় একটি ভাষা আছে। ভাষার দূরত্বের বিড়ম্বনা কাটাতে সে দ্রুতলয়ে বলে ওঠে– 'হাগ্‌তে হুজুর, হাগ্‌তে।' প্রকৃতপক্ষে খুব সকালে বিছানা ছেড়ে সে রাস্তায় এসেছিল, খানিকটা এগিয়ে রাস্তার বাঁয়ে বিশাল বাঁশঝাড়ের মধ্যে ওই প্রাতঃক্রিয়াটি নিশ্চিন্তে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই। কিন্তু হঠাৎ এই অভাবিত গেরো অতিক্রমের উপায় ঠাহর করতে না পেরে অবশেষে পায়খানা ফেরার ভঙ্গিতে ধপাস করে মাটিতে বসে এই সাত সকালে মাঠের দিকে আসার নির্দোষ হেতুটি সে ঘোষণা করে মুখে– 'ভড় ভড় ভড়াৎ...।'

তিন চারজন খানসেনা হো হো অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। ওদের মধ্যে একজন আবার খামচে ধরে তার কাঁধ, চিৎকার করে ওঠে– শ্যালে মুক্তিকা বাচ্চা, তোমলোগ মালাউন হ্যায়?

এবার কী বলবে সে! এক গেরো কাটিয়ে আরেক গেরোয় বন্দি হয়। জিইয়ে রাখা কই মাছের মতো খলবলিয়ে কতো কথা যে বলছে ওরা, তার কিছুই আর মাথায় ঢোকে না। এমনকি অবিরাম চড়থাপ্পড়, কিল-ঘুসিরও আর আগের মতো অনুভূতি হয় না। সে দেখতে পায় দাউ দাউ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে পুবপাড়ার ঘরবাড়ি। দড়ি ছিঁড়ে হাম্বা রবে পালিয়ে আসছে একটি কালো এঁড়ে। সে পেছন ফিরতেই হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার জোগাড়– আগুন তাদের পাড়াতেও। এইবার সে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। আর ঠিক তক্ষুণি একজন পাকসেনা হেঁচকা টানে খুলে দেয় তার পরনের লুঙ্গি। খুলে যায় না ঠিকই, তবে ছিঁড়ে যায়। জাতি পরিচয়ের দণ্ডটিও ভয়ে লজ্জায় শামুক। মুখ লুকিয়েছে আপন বিবরে। তবু তারা প্রার্থিত চিহ্ন খুঁজে পায়, হেসে ওঠে সমস্বরে, তারপরই বিশেষ পুরস্কার– সংবলিত লাথি তার দিগম্বর পাছায়। সেই লাথির গতিতেই সে শুরু করে দিগম্বর দৌড়।

সে দিনই দুপুর নাগাদ দুধসর গ্রামের জনমুনিষ্যি ফাঁকা হয়ে গেল। সুনসান নীরবতা। পোড়া ভিটেয় ধূমায়িত আর্তনাদ। প্রথম দিনের অপারেশনে এ গ্রামের মোট তিনজন মানুষ মরেছে। গ্রামে থাকল এই মৃতদেহ। রহিম বক্সের নতুন বউকে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারিরা, সেও থাকল। কোথায় থাকল, জীবিত নাকি মৃত, আবার কখনো এ গ্রামে ফিরে আসতে পারে কি না, গ্রামের লোকেরা এত কথা ভাবার সময় দিলো না রহিম বক্সকে। সবাই বেরিয়ে পড়ল গ্রাম ছেড়ে। অবশ্য এর আগেই, সে প্রায় মাসখানেক হবে, এ গ্রামের মোট আঠারোজন জোয়ান ছেলে দলবেঁধে গেছে ওপারে। বর্ডারের ওপারে করিমপুরে তারা গেছে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে। তারপর এই এক মাসে পুবপাড়ার আলেকচাঁদ আর বিলপাড়ার নিয়ামত– এই দু'জন পরিবার-পরিজন নিয়ে চলে গেছে, ইন্ডিয়ায় ওদের পূর্বপুরুষের বাস ছিল। এখনো অনেক আত্মীয়স্বজন আছে সেই ভরসায়। দুধসর আসল বাসিন্দাদের গ্রাম। রিফ্যুজি ছিল দু'ঘর, ঐ নিয়ামত আর আলেকচাঁদ। এক মাস পরে সবাই রিফ্যুজি হয়ে চলল ইন্ডিয়ায়। সবাই এই এক মাস বিলম্ব করেছিল যার ভরসায়, সেই মালেক মুন্সিকে দিয়েই এ গ্রামে হত্যালীলার সূত্রপাত হলো। আজীবন মুসলিমলীগের খেদমত করেছেন। একদা বেসিক ডেমোক্রেসির আস্বাদ গ্রহণ করেছেন। তারই একমাত্র ছেলে খালেক মুন্সি। মুক্তিযুদ্ধে যাবার পর লোকটা কেমন যেন পাল্টে গেল। গ্রামের সবাইকে ডেকে নিরাপত্তার কথা শোনালো। কে জানত তার নিজের নিরাপত্তাই এতটা অনিশ্চিত ছিল। এরপরও মাটি কামড়ে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। সবাই পা বাড়ালো অনিশ্চিত গন্তব্যে।

বটতলার মোড় ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় উঠেই মনে হলো এ এক বিশাল পিঁপড়ের সারি। পায়ে পায়ে পিলপিল চলেছে। দুধসরের সবাই প্রায় ঝাড়া হাত-পা। এক বস্ত্রে পথে নেমেছে। আগুনের লেলিহান শিখা থেকে কেউবা টিনের বাক্স, কেউবা ঘরে পোষা ছাগলটা কোনো মতে বাঁচাতে পেরেছে, তাই নিয়েই যাত্রা করেছে। বিলপাড়ার নিহাজদ্দি তার অর্থব বুড়ি মাকে বাঁশের

ঝুড়িতে বসিয়ে সেই ঝুঁড়ি মাথায় নিয়ে চলেছে। একজনের মাথায় আবার ধাড়ি-বাচ্চাসহ মুরগির ঝাঁকা। থেকে থেকে সেখান থেকে কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে।

সেই সাত সকালে বাহ্যি মাথায় করে দিগম্বর দৌড় দৌড়েছিল যে লোকটা তার হাতে বা মাথায় কিছু নেই। হাতে থাকা বলতে পাঁচ-ছ'বছরের পটলের হাত। তিড়িংবিড়িং করে লাফানো স্বভাব। এই যে নিজের গ্রাম ছেড়ে, জন্মভিটে ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা, সকলের চোখে মুখে উদ্বিগ্নতার ছায়া– এসব তাকে মোটেই আক্রান্ত করেনি। থেকে থেকে কেবল খিদের দাবি জানানো আর বাপের মুঠো আলগা হলেই ভোঁ দৌড়। সেই তুলনায় কোলের মেয়েটা রয়েছে আরো নিরুদ্বিগ্ন। মাই কামড়ে মায়ের বুক থেকে নিংড়ে চলেছে নিজের একমাত্র চাহিদা। কিন্তু চলন্ত মায়ের বুক থেকে মুখ সরে গেলেই মাঝে মধ্যে কাঁই-কুঁই কাঁদছিল। কান্না শুনে চোখ ফেরাতেই সে দেখতে পায়, বৌয়ের চোখ ছলছল করছে। একটা কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু নিজেকে সামলায়, পটলের মতো ওর মাও যদি পেটের খিদের কথা জানিয়ে বসে! কিন্তু না, খানিক পরে সে নিজেই ফ্যাঁচ করে নাকের সর্দি ঝেড়ে বলল– আমাদের সাদা মুরগিডা ইবার বারোডা ডিম নিয়ি বসিছিলু, পুইড়ি ছাই হয়ি গেল।

কী অবাক কাণ্ড! পথের ক্লান্তি, পেটের খিদে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ– এসব কিছু ছাপিয়ে সাদা মুরগির শোকই বড়ো হলো পটলের মার কাছে। আপন মা-বাপের কথা মনে পড়ায় চোখ ছলছল করছে এমনও হতে পারত। কত তুচ্ছ বস্তুই যে মেয়ে মানুষের কাছে অসামান্য হয়ে উঠতে পারে ভেবে পায় না সে।

একটানা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তিতে শরীর যখন অবসন্ন, পা দুটো আর চলতে চায় না। পটলসহ সব শিশুই আপন আপন বাপের কাঁধে চেপে বসেছে, সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকার বিদীর্ণ করে তখনই সম্মিলিত স্লোগান শোনা গেল মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য সেই স্লোগান। কালভার্ট পেরিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, জায়গাটার নাম নন্দনপুর। শরণার্থী শিবির আছে, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প আছে।

স্লোগান শুনে পুরো দলটা আবারও বল পায়, সাহস পায়, নড়বড়ে শরীরগুলো আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বাপের কাঁধ থেকে অবসন্ন পটলও সে স্লোগানে যোগ দেয়, আঙুল উঁচিয়ে ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় সেই স্লোগান। সেই তোড়ে সারা শরীরে ঝাঁকুনি খায় সে। তার মুখ সরে না। বাগযন্ত্র সরব হয় না। দুধসরেও মিটিং-মিছিল হয়েছে, স্লোগান উঠেছে, সে কখনো যোগ দেয়নি। কিন্তু আজ এই ভিনগ্রামে দুঃসহ পদযাত্রায় ঐ স্লোগান শুনে তার বুকের ভেতর শিরশির করে ওঠে, গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়, ভেতরে ভেতরে কে যেন নত হয়ে আসে। আড়চোখে পটলের মার দিকে একবার তাকায়। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখতে পায় না। তবু খুব মনোযোগ দিয়ে তাকায়। ওকে যেদিন প্রথম দেখে, সেই রাতে বুকের মধ্যে এই রকম শিরশিরানির অনুভূতি টের পেয়েছিল।

হঠাৎ অন্ধকার বিদীর্ণ করে তীব্র আলোর ফোকাস এসে পড়ে রাস্তায় উপরে। পায়ে পায়ে চলা ধুলোর কণা সেই আলোর রেখায় নাচানাচি করে। বেশ কিছুক্ষণ থেকে যে যান্ত্রিক গোঙানিটা শোনা যাচ্ছিল, এতক্ষণে তা স্পষ্ট হয়। পেছন থেকে তেড়ে আসছে মিলিটারির ট্রাক। হেডলাইট থেকে আছড়ে পড়া আলো ছেড়ে সবাই অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়ার জন্যে রাস্তার দু'পাশে ক্ষেতখামারে নেমে পড়ে হুটোপুটি করে। প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দে উড়ে গেল পেছনের কালভার্ট। তারপরই গোলাগুলির বিরামহীন তড়পানি। ঘটনার এই আকস্মিকতায় কে কোথায় ছিটকে পড়ে তার ঠিক নেই।

পরদিন কাক ডাকা ভোরে তারা মুখরাপুরের নাগাল পায়। অর্ধেক মানুষ এসেছে। বাকি অর্ধেকের সঠিক নিকেশ নেই। এদের সবাই যে গুলি খেয়ে মরেছে তা হয়ত নয়, তবে দলছুট হয়ে গেছে অনেকেই। হাতের মুঠোয় ধরে রাখা পটলকেই পাওয়া গেল গোলাগুলি থেমে যাবার অনেক পরে। রাস্তার ডান দিকে যে ও কখন কীভাবে গেল হিসেব মেলাতে পারে না। না, পটলের তেমন কিছুই হয়নি। বিলপাড়ার লিহাজদ্দির মা ঝুড়ির মধ্যে মরে পড়ে আছে। পটল তার পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে। চোখে মুখে নির্বাক ধন্দ। মুখরাপুর আসার পর তার মুখে কথা ফোটে। শরণার্থী শিবিরের সামনে তারা ধপাস করে বসে পড়ে। পাশেই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প। সেখান থেকে খালেক মুন্সি ছুটে আসে দুধসরের মানুষজন দেখে। গ্রামের খবর জিজ্ঞেস করে, পথের বর্ণনা শোনে। বুঝা যায়, ওর বাপের মৃত্যু সংবাদ আগেই পেয়েছে।

হঠাৎ পটলের মায়ের আর্তনাদে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে চারদিক! প্রভাত পাখির কাকলি যেন থেমে যায়। বুকের কাপড় আলগা করে বাইরে বের করে আনে কোলের মেয়ে। তার বিলাপের আহাজারি থেকে বুঝা যায়, ঐ ছোট্ট শিশুটি আর বুকের দুধ টানছে না, এ অমৃতে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। পুবপাড়ার করিমন বেওয়া হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে কোলে নিতে যায়। পটল এবং তার ছোটো বোনটির জন্ম হয়েছে এই করিমন বেওয়ার হাতেই। কাজেই তার অধিকার অগ্রগণ্য। কিন্তু পটলের মা কিছুতেই ঐ নিষ্প্রাণ মাংসপিণ্ডটি হাতছাড়া করে না। বরং এবার সে আরো ঘনিষ্ঠতায় জাপটে ধরে তার শিশু সন্তানকে। দেখে মনে হয়, যেন কেউ জোর করে কেড়ে নিতে আসছে তার মেয়েকে, মাতৃত্বের সবল বাহুতে জড়িয়ে সে রুখতে চায় সেই প্রবল আগ্রাসন। এতক্ষণে করিমন বেওয়া পটলের বাপকে খোঁচায়, মেয়িডার গা যে একেবারে শেতল কালা হয়ি গিয়িছে। যাও, তুমি একবার কোলে ন্যাও।

করিমনের এই আহ্বানে সে সাড়া দেয় না। পটলের মায়ের দিকে সে পা বাড়ায় না। আপন কন্যার দিকে সে হাত বাড়ায় না। মানবিক এই সব সূক্ষ্ম টান অতি তুচ্ছ হয়ে পড়ে। এই দুঃসময়ে কেন যেন তার মনে পড়ে যায় সেই অবিস্মরণীয় সংলাপ– তুমলোগ মুক্তিকা বাচ্চা হ্যায়?

সে হঠাৎ স্ত্রী-পুত্র পরিজন সবার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় এবং অত্যন্ত প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে– খালেক ভাই, আম্যু ট্রেনিং নেব, যুদ্ধ করব। চলো খালেক ভাই, আম্যুও মুক্তি হব।

লোকটা যতই সহজসরল, নির্বোধ নির্বিকার এবং সাধারণ লোক হোক না কেন, যুদ্ধে যাওয়াই যেন একেবারে অনিবার্য হয়ে ওঠে তার কাছে।

———— ○ ————

যুদ্ধদিনের মহান স্মৃতি

হাসান হাফিজ

রক্তপিছল পথ পেরিয়ে
তোমাকে পাই স্বাধীনতা
তুমি আমার প্রাণের মর্ম
আনন্দসুখ বিয়োগ-ব্যথা।

শোষণ পীড়ন জেল জুলুমে
শৃঙ্খলিত বন্দি থেকে
রক্তরঙে তোমার ছবি
মানসপটে নিপুণ এঁকে।

হই গেরিলা অস্ত্র ধরি
মাতৃভূমি স্বাধীন করি
বীরের মতো আমরা মরি
শহীদ যাঁরা, তাঁদের স্মরি।

লাল সবুজের এই পতাকা
রক্তদামে ছিনিয়ে আনি
স্বাধীনতার সত্য পথে
লাখ শহীদান অমর জানি।

মায়ের ঋণে মাটির ঋণে
পাই প্রেরণা শক্তি সাহস,
মুক্তিদিনের রক্তছবি
শাশ্বত সে হয়নি যে বশ।

চারদিকে ভণ্ড

শাহানা সিরাজী

বাতাসের বুকে নাম লিখে আসি আরবার
ব্যঞ্জনায় পূর্ণ এই দেশ এই হাসি অবিকার।
ভেজা পায়ে যাই শীতার্ত মটরের কাছে হেঁটে
এমন লকলকে দেহে, বলো, কী শোভা আছে!
কোন অভিলাষে এতো ফুল হাসে মুখ টিপে
জ্বলজ্বলে দ্যুতি ছড়ায় আবার বাংলার মাঠে।
উপোসী নদী হাহাকার, রুক্ষমূর্তি ছারখার
পত্রঝরার গানে নাচে মলয় খোঁপা খুলে তার!

দেশের মাটি দেশের ছবি মিলে ঐক্যতান
মলিন পোশাকে জানায় জীবনের আহবান!
রুদ্র মনের ক্লান্তি মেখে ওড়াই স্বপ্নফানুস
স্বপ্নরা হারায় পথ রক্তাক্ত আবার মানুষ
মরীচিকার তীব্র টানে উন্নাসিক রাজদণ্ড
কাঁদে দোয়েল কাঁদে চড়ুই সব কেন ভণ্ড!

আমার এই বাংলাতে

তানিয়া খান

দেখেছো কি মাঠে মাঠে সবুজ হাসে
সোনা ঝরা রোদের পাশে
প্রিয় ঠিকানাতে?

আমার এই বাংলাতে।
কে দেখেনি ভোরের শিশির দূর্বাঘাসে,
এক নিমেষেই ভিজিয়ে দেয়
পা ছোঁয়াতে।

'আমার এই বাংলাতে।
কে দেখেনি আগুন রাঙা ফাগুন এসে
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়
মন রাঙাতে!

আমার এই বাংলাতে।
কে বোঝেনি প্রাণের খুশি সকালবেলায়
ডুবোজলের পান্তা ভাতে,
ইলিশ সাথে! আমার এই বাংলাতে।

কে দেখেনি রুপালি চাঁদোয়া জোসনা রাতে
শাপলা বিলের ফুলেরা যখন
ভোরের অপেক্ষাতে।
আমার এই বাংলাতে।

মানুষ বদলায়

রুস্তম আলী

মানুষ বদলায়–
কারণে বদলায়, অকারণে বদলায়
হুজুগে বদলায়।

মানুষ বদলায়–
ক্যালেন্ডারের পাতায় বদলায়
ঘড়ির কাঁটায় বদলায়।

মানুষ বদলায়–
ভোরের আলোয়ে বদলায়
রাতের আঁধারে বদলায়।

মানুষ বদলায়–
স্বার্থে বদলায়, অর্থে বদলায়
বিনিময়ে বদলায়।

মানুষ বদলায়–
গিরগিটির মতো বদলায়।
মানব জীবন সত্যি বৈচিত্র্যময়!

আকাশ ছোঁয়ার দিনে

সুজন বড়ুয়া

শেষপর্যন্ত দলছুট পাঞ্জাবি সৈন্যটিকে বাগে পেয়ে গেল রাতুলরা। সৈন্যটির কী হাল করবে এখন তা নিয়ে চলছে জল্পনাকল্পনা। সৈন্যটিকে ঘিরে ধরে আছে সবাই। সবাই মানে রাতুলের পাড়া-গাঁয়ের বন্ধু-সাথির দল– রাতুল, চন্দন, দুকুল, ঝন্টু, রূপন, রণজয়, উত্তম ও শিমুল– এই আট কিশোর। ক্লাস এইট-নাইন পড়ুয়া খেলাধুলার সঙ্গী সবাই। গ্রামের মামা-কাকারা আদর করে আটজনের এই দলটাকে বলে বিচ্ছুবাহিনী। যুদ্ধের কঠিন সময়েও তাদের জোট ভাঙেনি। মাঝেমধ্যে এক হয়ে খেলাধুলা করেছে তারা। আর এখন তো কথাই নেই। ঢাকায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। সেই বিজয়ের উল্লাসে সবার সঙ্গে মাতোয়ারা বিচ্ছুবাহিনীও। এমন উত্তপ্ত মুহূর্তে শত্রুপক্ষের একজন সৈন্যকে এভাবে মুঠোয় পাওয়া বিচ্ছুবাহিনীর জন্য নিশ্চয় বাড়তি উত্তেজনার বিষয়। অথচ এমন ঘটনা ঘটতে পারে কদিন আগেও তা কারো কল্পনায় আসেনি। তবে কিছুদিন ধরে গ্রামটা হয়ে পড়েছিল নির্জীব-নিঃসাড়। প্রাণের সাড়া ছিল না কোনো দিকে। সবার মধ্যে যেন রয়েসয়ে গুটিয়ে চলা ভাব। এক ধরনের ভয় চেপে রেখেছিল সবাইকে। না জানি কী ঘটতে যাচ্ছে।

গ্রামে শীত পড়া শুরু হয়েছে বেশ আগে থেকে। শীত এখন জাঁকিয়ে বসেছে অনেকটা। যদিও হেমন্তকাল শেষ হয়নি, তবু শীতের দাপটে জবুথবু অবস্থা। বিকেলের পরেই প্রায় কুয়াশায় ঝাপসা চারদিক। সারা রাত শিশির পড়ে টিপটিপ। সকালে পথেঘাটে ঘাসে ঘাসে শিশির কণা ঝলমল করে হীরের টুকরোর মতো। মাঠে মাঠে পাকা ধানে সোনালি রঙের আভা।

এরই মধ্যে কেমন পাল্টে গেল যুদ্ধের গতিধারা। সবদিকে হচ্ছে শুধু একতরফা আক্রমণ। সেটা মুক্তি আর মিত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে। হানাদার পাকিস্তান বাহিনী যেন পিছু হটতে শুরু করেছে। তবে কি বাঙালির বিজয় আসন্ন! মুক্তি বাহিনী কি জয়ের দ্বারপ্রান্তে! ভেতরে ভেতরে এমন প্রশ্ন নাড়া দিয়ে যায় সবাইকে। কিন্তু মুখ খোলে না কেউ। রাতুলের বাবা সুধীরবাবু গোপনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনেন আরো আগ্রহ

নিয়ে। মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর ধারাবাহিক বিজয় সংবাদে উল্লসিত হন মনে মনে। বেতারেই তিনি শুনতে পেলেন কদিন আগে গভীর রাতে ঢাকার কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের ওপর হামলা চালিয়েছে ভারতীয় জঙ্গি বিমান। এতে অকেজো হয়ে যায় পাকিস্তানের সাজানো সব যুদ্ধবিমান। যুদ্ধে তাদের একেবারে কোণঠাসা অবস্থা। দিকে দিকে তাদের দখলমুক্ত হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চল। অবশেষে একদিন সুধীরবাবু আনন্দ ধরে রাখতে পারেন না আর। আপন মনে বলে ওঠেন, আর দেরি নেই। হানাদার বাহিনীর জারিজুরি শেষ। এবার লেজ গুটিয়ে পালাবে।

সুধীরবাবুর কথাই ঠিক হলো। দুদিন যেতে না যেতে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করল পাকিস্তান বাহিনী। জয় হলো বাঙালির। পৃথিবীর মানচিত্রে সৃষ্টি হলো স্বাধীন সার্বভৌম এক নতুন দেশ– তার নাম 'বাংলাদেশ'।

রাতুলরা গ্রামে খবরটা যখন পেল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। শীতের সন্ধ্যা। তার ওপর আগে থেকেই চারপাশ ভয়মাখা, জড়সড় পরিবেশ। বিজয় লাভের সুখবরটি তাই দ্রুত প্রচার পায় না গ্রামে। তবু রাতুলদের ঘরে জমে উঠল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনার আসর। আজ আর উচ্চশব্দে বেতারের অনুষ্ঠান শুনতে বাধা নেই। দেশ স্বাধীনের খবর শুনে বাড়ির কাকা-জ্যাঠারা সব ছুটে এসেছেন রাতুলদের ঘরে। বাবার সঙ্গে বারান্দায় বসে সবাই রেডিওতে শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। গরম গরম সব খবর কথিকা চরমপত্র গান ইত্যাদি। খানিক পর পর বেজে চলেছে বিজয়ের গান। ...স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে জাগছে বাঙালিরা, রুখবে তাদের কারা, আজ রুখবে তাদের কারা... ।

চাপা আনন্দে কেটে গেল রাত। সকালটা যেন নিয়ে এলো অন্যরকম এক দিন। কুয়াশার চাদর ঠেলে আকাশের পুব কোণে উঁকি দিচ্ছে সূর্যটা। স্বাধীন বাংলাদেশে ওঠা প্রথম সূর্য। অন্যদিনের তুলনায় যেন বেজায় লাল আজ সূর্যের রং। গ্রামটা যেন জেগে উঠেছে আড়মোড়া ভেঙে। চারদিকে দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে সবাই। শুধু মানুষ নয়, পাখপাখালিও ডানা ঝাপ্টাচ্ছে গাছে গাছে। পায়রাগুলো গলা ফুলিয়ে নেচে নেচে বাক-বাকুম ডাকে মাতিয়ে তুলেছে উঠোন। গরুর বাছুরটা নাচছে তিড়িং বিড়িং। বেড়ালটা মিউঁ মিউঁ করে ঘুরছে ভাবনাহীন। যেন আজ সবাই মুক্ত-স্বাধীন। সবার চোখেমুখে অপার আনন্দ।

পোষা কুকুর টমিটা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুরঘুর করছিল রাতুলের চারপাশে। রাতুল টমির মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে বলল, হ্যাঁরে টমি, আমরা এখন স্বাধীন। তোকে আর ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না। হানাদার মিলিটারি আর দেখা যাবে না, তোকে ঘেউ ঘেউও করতে হবে না, বুঝেছিস। হানাদারদের দফা শেষ।

বলতে বলতেই রাতুলের চোখ যায় বাড়ির সামনের বড়ো রাস্তার দিকে। এটা রামগড় রোড। চট্টগ্রাম শহর থেকে উত্তরে ভারত সীমান্তবর্তী রামগড়ের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান সড়ক। গত কয়দিন এ সড়ক ছিল নীরব সুনসান। গাড়ি চলার ধুন্দুমার ছিল না। গত রাত থেকে আবার শুরু হয়েছে গাড়ি চলাচল। তবে আগের মতো দ্বিমুখী নয়। এখন শুধু আসছে উত্তর দিক থেকে। আসছে না বলে বলা ভালো ফিরছে। এতদিন যুদ্ধের নামে যত সৈন্যসামন্ত গোলাবারুদ ওদিকে জোগান দেওয়া হয়েছে গতকাল আত্মসমর্পণের পর ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ওসব। একের পর এক ফিরে আসছে সৈনিকভর্তি সব খোলা জিপ-ট্রাক এবং যুদ্ধ-ট্যাংক। তবে যাওয়ার সময় সবগুলোর যেমন জঙ্গিভাব ছিল এখন আর তা নেই। সব কেমন বিপর্যস্ত। বাঘ হয়ে গিয়ে যেন মেনি বেড়াল হয়ে ফিরে আসছে। আসছে তো আসছেই। আসা শেষ হওয়ার যেন নাম নেই।

এর মধ্যে রাতুল বন্ধু-সাথিদের সঙ্গে জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। সবাই দাঁড়িয়ে ছিল গ্রামের মাঝখানটায়, তেপথের বট গাছের গোড়ায়। আজ বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হওয়ার কথা সবারই। কিন্তু বিচ্ছুবাহিনীর সদস্যদের মনে আনন্দ নেই তেমন। কারণ অনেকদিন ধরে রণজয় আর শিমুলের বাবার খোঁজ নেই কোনো। সেই এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে তাঁরা দুজনই নিখোঁজ।

শিমুলের বাবা ভবেশ বড়ুয়া চাকরি করতেন চিটাগাং পোর্ট ট্রাস্টে। এপ্রিল মাসে সরকার কর্মচারীদের চাকরিতে যোগদানের নির্দেশ দিলে তিনি গিয়েছিলেন চাটগাঁ শহরে। সেই থেকে কোনো খোঁজ নেই তাঁর। আর রণজয়ের বাবা বিমল বড়ুয়া দুই শরণার্থীর গাইড হয়ে তাদের সীমান্ত পার করে দেবেন বলে যাত্রা করেছিলেন রামগড়ের দিকে। তিনিও ফিরে আসেননি আজ অবধি। এজন্য সবাই চিন্তিত। তাঁরা কি আদৌ বেঁচে আছেন?

সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে হতে উত্তর দিক থেকে জিপ-ট্রাক এবং যুদ্ধ-ট্যাংক আসা বন্ধ হয়ে গেল। এবার সৈন্যরা আসতে শুরু করেছে পায়ে হেঁটে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ড্রেস পরা প্রত্যেক সৈনিকের পিঠে বাঁধা ব্যাকপ্যাক আর কাঁধে রাইফেল। একে একে হেঁটে আসছে সারিবদ্ধভাবে। যেন সারি করে চলেছে পিঁপড়ের দল। সবারই ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থা। কারো কারো অবস্থা একেবারে মরণাপন্ন। পা চলে না। শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলতে হচ্ছে তবু। কত দূর থেকে সৈন্যরা হেঁটে আসছে কে জানে? রামগড় সীমান্ত এই ছিলোনীয়া-ছাদেকনগর বৌদ্ধ গ্রাম থেকে কম দূর নয়। চল্লিশ মাইলের মতো পথ। গাড়ি চড়ে বা পায়ে হেঁটে যেভাবেই আসুক ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা।

পাকিস্তান সৈনিকদের এই চলাচলের কারণে গ্রামের মানুষরা গুটিয়ে আছে প্রায়। মনের ভয় এখনো কাটেনি পুরোপুরি। কেউ অবাধ চলাচল করছে না রাস্তাঘাটে। সকালের দিকে বিজয় উল্লাসে যারা বেরিয়ে পড়েছিল তারা আড়ালে আবডালে চলে গেছে আবার। চাপা পড়ে গেছে বিজয়ের পূর্ণ আনন্দ। রাতুলদের দলই কেবল ঘরের বাইরে। দুপুরে খাওয়ার জন্য বাড়িতে গেলেও তারা ফিরে এসেছে আবার।

দুপুর গড়িয়ে এখন বিকেল। পাকিস্তান সৈনিকদের সংখ্যা কমে আসছে ক্রমে। সারি পাতলা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। বিকেল গড়াতে গড়াতে আসছে ফাঁকা ফাঁকা একজন একজন করে। কখনো আসছে বেশ কিছু সময় পর পর। আগের তুলনায় সৈনিকরা যেন আরো বেশি ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন। কারো কারো একেবারে মরমর দশা। যেন এখনই ঢলে পড়ে যাবে রাস্তায়।

সন্ধ্যার আগে আগে রাতুলরা একমনে তাকিয়ে ছিল রাস্তার দিকে। দেখতে পেল, সত্যি, একজন সৈনিক ঢলে পড়ে যাচ্ছে রাস্তার ওপর। তার পেছনে আর কোনো সৈনিক নেই। হয়ত সে-ই শেষ সৈনিক।

ঘটনাটা ঘটল বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে পুব কোণের চৌরাস্তায়। তেপথের বটতলা থেকে সোজা এক দৌড়ে সেখানে হাজির হলো রাতুলরা। পেয়েছি এবার মওকা। আটজনে মিলে মুহূর্তেই ঘিরে ফেলল সৈনিকটিকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করল খানিক। সৈনিকটির হেলদোল নেই কোনো। মাঝারি উচ্চতার থলথলে গাবদাগোবদা স্বাস্থ্য। বস্তার মতো শুকনো মাটিতে পড়ে আছে নিশ্চল। মরে গেল নাকি? রাতুল নীচু হয়ে ঝটপট ডান হাতের পাতা খুলে ধরল সৈনিকের নাকের কাছে। না, মরেনি। শ্বাস-প্রশ্বাস আছে।

এরই মধ্যে সৈনিকের কাঁধ থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে নিলো শিমুল। অমনি সবাই হৈ হৈ করে উঠল একদফা। চন্দন দৌড়ে গিয়ে পাশের টিউবওয়েল চেপে হাতের জোড়তালুতে করে পানি এনে ছিঁটাতে লাগল সৈনিকের চোখেমুখে। সৈনিকের পিঠের ব্যাকপ্যাকটা খুলে নিলো রণজয়। চোখেমুখে কপালে ঠান্ডা পানির ছোঁয়া পেয়ে একটু যেন নড়ে উঠল সৈনিক। এবার উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই, হুররে, আমরা জ্যান্ত একটা পাঞ্জাবি জন্তু ধরছি।

রাতুলদের উল্লাসধ্বনিতে যেন হতচকিত সৈনিকটি। চোখ খুলল ধীরে ধীরে। আরো কিছুক্ষণ পর উঠে বসল মাটিতে।

সৈনিকের দিকে তাকিয়ে দুকুল বলে উঠল, মুক্তি মারতা হ্যায়? তুম নে কিতনে বাঙালি মুজাহিদোঁ কো কাতল কিয়া? এইবার তোমারে আমরা ভর্তা বানাব।

দেখো, ব্যাটা কেমন পিটপিট করে তাকায়।– বলতে না বলতে রণজয় আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈনিকের ওপর।– শয়তান, এরাই আমার বাবাকে হত্যা করেছে। আমি একে মেরে ফেলব।

সবাই হতভম্ভ। রণজয় উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ এমন করতে পারে তা কারো ভাবনার মধ্যেই ছিল না। দলে সবার চেয়ে কনিষ্ঠ, আবার শান্তশিষ্ট ছেলে রণজয়। বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণে ভেতরে ভেতরে সে এতটা ক্ষুব্ধ! যুদ্ধ-বাস্তবতা মানুষকে কত দ্রুত, কত বিস্ময়করভাবে বদলে দেয়! ঝটিতি সামলে উঠে রণজয়কে নিরস্ত করতে এগিয়ে আসে সবাই।

এই হৈ-হট্টগোলে ঘটনাটা চাউর হয়ে গেল গ্রামময়। গ্রামের কাকা-জ্যাঠারা বেরিয়ে আসতে শুরু করেছেন একে একে। বৌদ্ধ মন্দিরের কোণায় এই চৌরাস্তার অদূরেই শিমুলদের বাড়ি। শিমুলের জ্যাঠা সুধাংশুবাবু এই গ্রামের মাথা। তিনি থানা সদরের ফটিকছড়ি হাই স্কুলের শিক্ষক। সে হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সবার কাছে। ছেলেদের শোরগোল শুনে তিনিই ছুটে এসেছেন সবার আগে, এই, তোমরা কী করো, কী করো, থামো।

সুধাংশুবাবুর উপস্থিতিতে খানিকটা সংযত হলো সবাই। কিন্তু আজ তাঁর নিষেধাজ্ঞা মানতে নারাজ ছেলেরা। রণজয় আগের মতোই উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল, জ্যাঠা, এই জানোয়ারকে আমরা ছাড়ব না। এরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে, শিমুলদার বাবাকে হত্যা করেছে।

সুধাংশুবাবু আবার দুহাত তুলে ইশারা করে বলেন, রণ, তুমি শান্ত হও, সবাই আমার কথা শোনো। পাকিস্তানি বাহিনী এতদিন আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে ঠিক, কিন্তু শেষপর্যন্ত যুদ্ধে আমরাই জয় লাভ করেছি, তাদের পরাজয় ঘটেছে। এরা পরাজিত দলের সৈনিক। এখন তারা অসহায়, আর্তপীড়িত। আর্তকে সেবা দিতে হয়, মারতে হয় না। অসহায়ের সহায় হতে হয়। এটাই মানবতার শিক্ষা। তারা অমানুষ হতে পারে, আমরা কেন অমানুষ হব?

রাতুলদের কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবার সামনে সৈনিকটি পিঠ বাঁকিয়ে মাথা নীচু করে বসে আছে কলে আটকে পড়া ইঁদুরের মতো। তাকে দেখিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সুধাংশুবাবু আবার বলতে শুরু করেন, এই পরাজিত চুনোপুটিকে মেরে হাত ময়লা করব, আমরা কি তেমন কাপুরুষরে রণ! আমরা বীরের জাতি। আমরা যুদ্ধ করে জয়ী হতে জানি। পরাজিত সৈনিক মেরে আমাদের বীর সাজতে হবে না। আমাদের প্রতিশোধও নিতে হবে না। বীরেরাই ক্ষমা করে। বাঙালি বীরের জাতি, যুদ্ধ করে জিততে জানে, আবার ক্ষমাও করতে জানে।

এর মধ্যে গ্রামের ছোটোবড়ো অনেকে এসে জড়ো হয়েছে একে একে। সবাই সুধাংশুবাবুর কথা শুনছিল চুপচাপ। গ্রামে কেউ সাধারণত তাঁর উপরে কোনো কথা বলে না। খানিক চুপ থেকে তিনিই কথা বলে ওঠেন আবার, আর রণ, তোমাকে কে বলেছে, তোমার বাবা মারা গেছে। তোমার বাবা নিখোঁজ। যুদ্ধের সময় মানুষ এমন নিখোঁজ হতে পারে। আমার ছোটোভাই ভবেশ– শিমুলের বাবা, সেও তো নিখোঁজ, আমার ছেলে তাতুন যুদ্ধে গিয়ে ফিরে আসেনি। তার মানে কি তারা ফিরে আসবে না? সবে যুদ্ধ শেষ হলো, দু'একদিনের মধ্যে তারা নিশ্চয় ফিরে আসবে। আমরা অপেক্ষা করে দেখি। আশা করি তারা সবাই বেঁচে আছে।

উপস্থিত সবার চোখমুখ খুশিতে চিকচিক করে উঠল এবার। কেউ কেউ আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগল, তা-ই যেন হয়। আমাদের আত্মীয়স্বজন সবাই যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে।

রাতুলের বাবা সুধীরবাবু বলেন, দাদা, তা হলে এই সৈনিকের কী হবে এখন?

সুধাংশুবাবু চুপচাপ একটু ভাবেন। তারপর খুব ধীর কণ্ঠে বলেন, সৈনিককে ছেড়ে দেওয়াই মঙ্গল। তবে তাকে একা ছাড়া যাবে না। রাত হয়ে গেছে। অন্ধকার পথে একা সে কোথায় যাবে? মাঝপথে আবার কোন বিপদে পড়ে? ফটিকছড়ি থানায় মিলিটারিদের ক্যাম্প। চল, আমরা কয়েকজন গিয়ে সৈনিককে থানার ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে আসি।

এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হলো। থানার পথে রওনা দিতে দিতে সুধাংশুবাবু সস্নেহে ছেলেদের দিকে তাকান, তোমরা সবাই এবার বাড়ি যাও।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রণজয় আর শিমুলের বুকের ভেতর যেন বেজে উঠল একটি নতুন আশার দুন্দুভি; দু'একদিনের মধ্যেই বাবা বাড়ি ফিরে আসবেন। সত্যি বাবা ফিরে আসবেন!

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন এ কে খন্দকার বীর উত্তম

মো. তোফাজ্জল হেসেন

বিজয়ের মাসে না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শীর্ষ সেনানী এ কে খন্দকার বীর উত্তম। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিমানবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এই সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগে মৃত্যুবরণ করেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) সূত্রে জানা গেছে, ২০শে ডিসেম্বর সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে এই বীর মুক্তিযোদ্ধার বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি এক কন্যা, দুই ছেলে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তিনি ছিলেন অন্যতম সাক্ষী। সে সময় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগে তিনি পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান ছিলেন, তবে সেই পদ ত্যাগ করে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং পরবর্তীতে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ বা মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে নতুন করে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি বিমানবাহিনী প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাহিনীকে পুনর্গঠনে নেতৃত্ব দেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য সাহসিকতা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৩ সালে তাকে 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত করা হয়। এছাড়া ২০১১ সালে তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পদক লাভ করেন। তিনি সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

এ কে খন্দকারের পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার পুরান ভারেঙ্গা গ্রামে হলেও ১৯৩০ সালে তাঁর জন্ম হয় বাবার কর্মস্থল রংপুরে। শিক্ষাজীবনে ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৪৯ সালে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করার পর ১৯৫২ সালে তিনি পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। সামরিক জীবন শেষে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে তিনি দুই মেয়াদে সরকারের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টা গভীর শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, এ কে খন্দকার রণাঙ্গনের একজন সম্মুখসারির মুক্তিযোদ্ধা হয়েও দেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ রচনা করে বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলে ব্যাপক রোষানলে পড়েছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরাই ছিল তৎকালীন শাসনের দৃষ্টিতে তার 'অপরাধ'। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, এ কে খন্দকারের মৃত্যুতে একজন বীর সন্তানকে হারালো দেশ। তিনি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, সহযোদ্ধা ও গুণগ্রাহীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

মুক্তির সংগ্রাম ভাস্কর্য, যমুনা নদীর তীর, সিরাজগঞ্জ

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 06, December 2025, Tk. 25.00

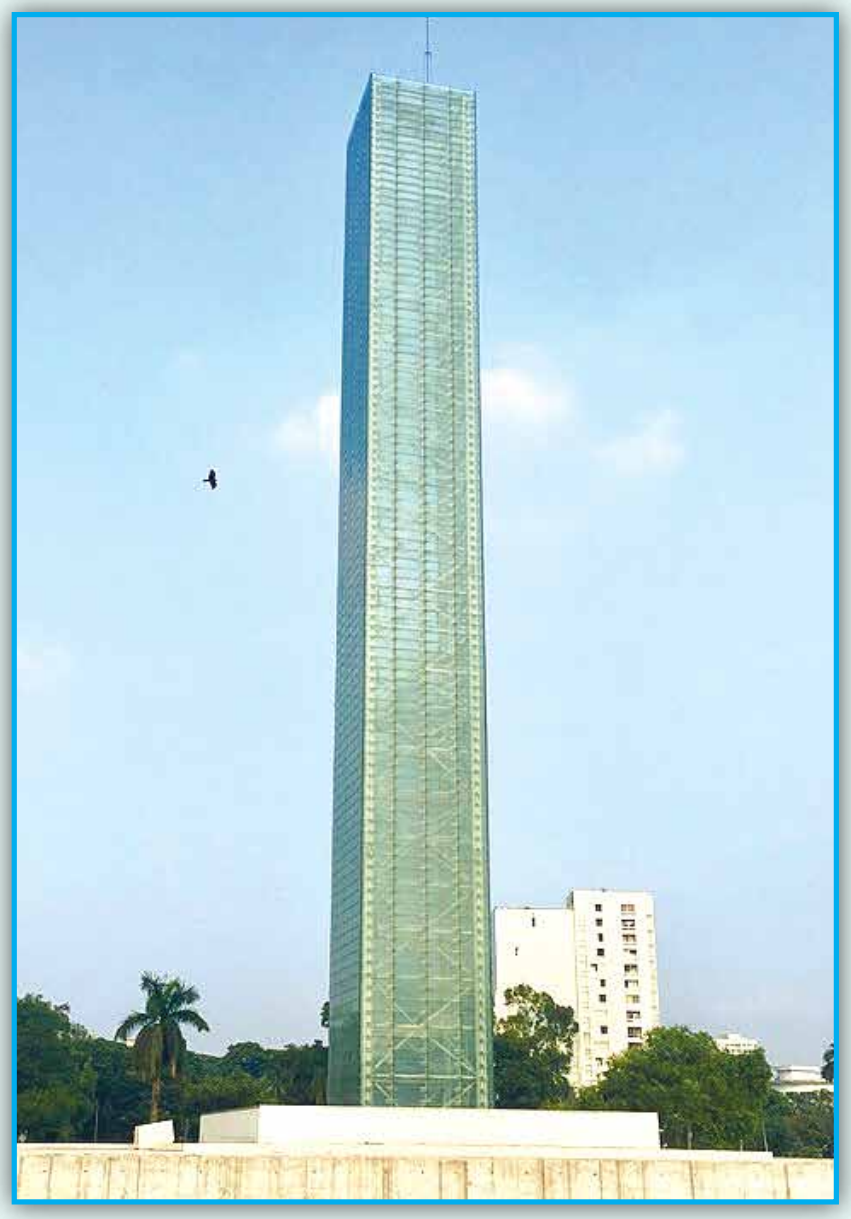

স্বাধীনতা স্তম্ভ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd